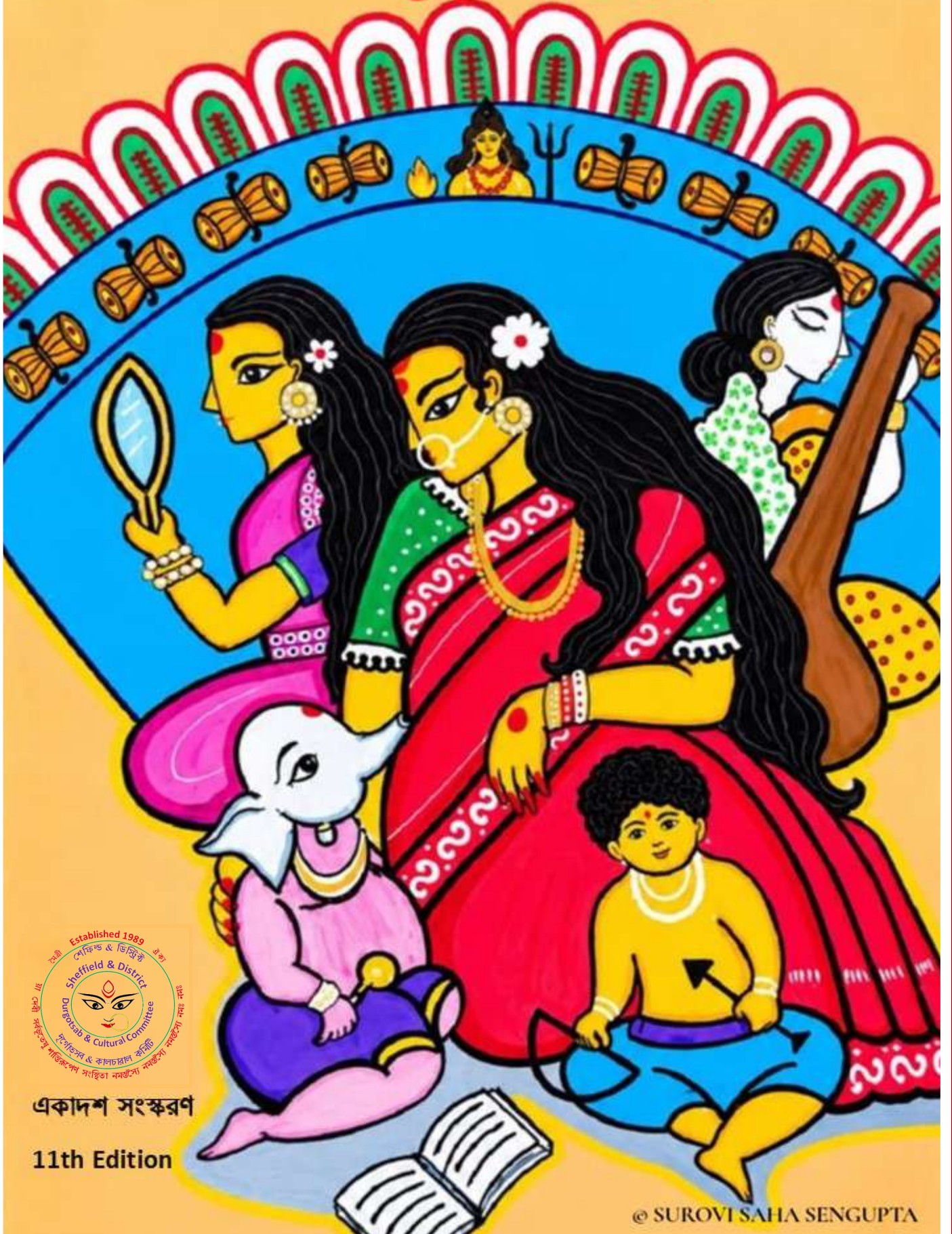


କାମାକ୍ଷୀ ୧୪୭୭



ଏକାଦଶ ସଂସ୍କରଣ

11th Edition

© SUROVI SAHA SENGUPTA



শুভ শারদীয়া

Sheffield & District Durgotsab & Cultural Committee
wishes you and your loved ones
a very Happy Sharodiya.



CONTENT

Welcome Note.....	3
Event Calendar.....	5
Address by Mayor.....	7
Address by Chairmen.....	8-9
Address by General Secretaries.....	10
Address by Editors.....	11
Meet the Committee.....	12-13
SDDCC Members list.....	14
SDDCC AGM Summary.....	15
SDDCC Financial Statement.....	16-17
Shared Stories and Experiences from the Past Year.....	18-31
Poetry Pages.....	32-42
Stories and Articles.....	43-93
Visual Anthology.....	94-104
Culinary.....	105-107
Obituary.....	108-109

2026-2027 EVENT CALENDAR

DAY	DATE	EVENT & TIME
Moha-Sashti	Friday 16th October শুক্রবার ২৯ আশ্বিন	Puja starts: 17:30 / Puja Aarti: 19:30 Puja Anjali: 19:30
Moha-Saptami	Saturday 17th October শনিবার: ৩০ আশ্বিন	Puja starts: 09:00 / Puja Aarti: 12:30 Puja Anjali: 12:30 Evening puja starts: 17:00 Evening puja Aarti: 19:00 Evening puja Anjali: 19:30
Moha-Ashtami	Sunday 18th October রবিবার: ১লা কার্তিক	Puja starts: 9:30 / Puja Aarti: 12:30 / Puja Anjali: 13:00 Ashtami Sandhi puja starts: 18:30 Evening Puja Aarti: 19:30 Evening Puja Anjali: 20:00
Moha-Nabami	Monday 19th October সোমবার: ২রা কার্তিক	Puja starts: 9:30/ Kumari Puja: 10:30/ Puja Aarti: 12:00/Puja Anjali:12:00/ Puja Hom: 15:30/ Evening Puja Anjali: 19:30
Moha-Dasami	Tuesday 20th October মঙ্গলবার: ৩রা কার্তিক	Puja starts: 10:30 Dasami Boron and Sindur-khela: 12:00
Bijaya Sanmilani	Saturday 24th October শনিবার: ৬ই কার্তিক	Cultural Function: 16:30/Dinner: 20:00
Lakhsmi Puja	Sunday 25th October রবিবার: ৭ই কার্তিক	Puja starts: 18:00/Puja Anjali: 19:00
Kali-Puja	Sunday 8th November রবিবার: ২২ শে কার্তিক	Puja starts: 14:30/ Puja Aarti: 18:30/ Puja Anjali: 19:00
Saraswati-Puja	Thursday 11th February 2027 বৃহস্পতিবার : ২৭ শে মাঘ	Puja starts: 11:00 / Puja Anjali: 12:30
Annual General Meeting	Sunday 9th May 2027 রবিবারঃ ২৬ শে বৈশাখ	Open to All Members: 12:00 PM Onwards
Poila Baishak	Saturday, 17 April 2027 শনিবার, ৪ বৈশাখ ১৪৩৪	Celebration of Bengali New Year



**Where Fear Ends, Shakti Begins.
In Every Heart Resides a Durga.
*An Oil Painting by Ishita Chatterjee,***

Sheffield and District Durgostab
and Cultural Committee

My Ref: MSC / LH / GB

Your Ref:

Date: 04/08/2026

Enquiries to: Mayors Office

Direct Dial: 01226 773804

E-Mail: mayorsoffice@barnsley.gov.uk



Dear Members of the Durgostab Society,

I am sending my warmest greetings and best wishes to you all as you gather to celebrate the auspicious festival of Durga Puja.

While I am unfortunately unable to join you in person this year, I am delighted that the Deputy Mayor will be attending on my behalf to represent Barnsley Council and share in your vibrant celebrations.

Durga Puja is a truly profound occasion. At its heart, it honours Goddess Durga and her triumphant victory over evil, symbolizing the enduring power of good, light, and righteousness over darkness. Beyond its sacred traditions, it is a magnificent celebration of Shakti (divine feminine power), strength, and compassion. It serves as a powerful reminder of the resilience within our communities and the importance of coming together in unity, peace, and joy.

Our town is immensely enriched by the cultural diversity and shared values that events like this bring. I want to extend my heartfelt thanks to the Durgostab Society for your dedication, hard work, and hospitality in keeping these rich traditions alive and sharing them with the wider Barnsley community.

I hope the festivities bring peace, health, and prosperity to you and your families. Wishing you all a memorable and joyful Durga Puja!

Warmest regards,



Liam Hardcastle
Mayor of Barnsley

সভাপতির শুভেচ্ছা

বহুদিন বিদেশে থেকেও আমরা বাঙালি ঐতিহ্য মেনে বারো মাসে তেরো পার্বণ পালন করে থাকি। বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গাপূজো এসে গেল। কলকাতার দুর্গাপূজো UNESCO র intangible cultural heritage of humanity হিসেবে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে। শেফিল্ড ও জেলা দুর্গোৎসব কমিটির ৩৮ তম বছরে আপনাদের সবাইকে এই অনুষ্ঠানে সামিল হতে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

বিগত প্রায় চার দশক ধরে মা দুর্গার আরাধনার সাথে সাথে এই কমিটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রীতি ভোজের মাধ্যমে এই উৎসবকে সামাজিক মিলনৎসবে পরিণত করে তোলে।

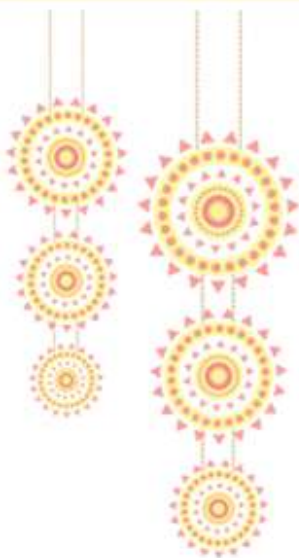
শুধুমাত্র এখানে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালিরাই নন তাঁদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের লোকজনও এই মহতী অনুষ্ঠানে সমবেত হন। প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমরা এখানকার প্রবাসী বাঙালিরা একত্রিত হয়ে একদিকে যেমন বাঙালি পরিবেশ গড়ে তুলি তেমনি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও বাঙালি ঐতিহ্য তুলে ধরতে তৎপর হই।

জয় মা দুর্গা।

অভয় দাস



Vice Chairman's Greetings



Durga Puja, the foremost festival of the Bengali community, is not merely a religious observance but a celebration of our shared identity, values, and cultural legacy. The recognition of Kolkata's Durga Puja by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage of Humanity further underscores its significance on the global stage.

It gives me immense pleasure to extend a warm invitation to you all to join us in celebrating the 38th Sheffield & District Durga Utsav. For nearly four decades, our Committee has remained committed to preserving and promoting Bengali culture by bringing together our community in the spirit of devotion, fellowship, and inclusivity. Alongside the worship of Goddess Durga, the festival offers a vibrant programme of cultural performances, community gatherings, and traditional hospitality, providing an opportunity for people of all ages to celebrate together.

Over the years, our Durga Puja has become much more than an annual religious festival. It is a cherished occasion that unites not only the Bengali community but also our friends, neighbours, and well-wishers from diverse cultural backgrounds. This collective celebration strengthens the bonds of friendship, mutual respect, and social harmony that enrich our multicultural society. Equally important is our responsibility to inspire and educate the younger generation, ensuring that they remain connected to the rich cultural heritage and values that define our identity.

On behalf of the Sheffield & District Durga Utsav Committee, I extend my sincere gratitude to all our members, volunteers, sponsors, patrons, and well-wishers for their continued support, which has made this celebration possible. We look forward to welcoming you and your family as we celebrate this auspicious occasion together with devotion, joy, and a shared sense of community.

JOY MAA DURGA.

Victor Palit

সাধারণ সম্পাদকের কলমে

সুধীবৃন্দ, সুহৃদয় প্রবাসীবন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীগণ,

শরতের শিশিরভেজা প্রভাতে কূজনরত বিহঙ্গকুল আর সুদূর নীলিমায় ভাসমান পেঁজা মেঘের দল যেন কোন এক অলৌকিক আগমনীর সংকেত বহন করিয়া আনে। দিগন্তে রূপালী রোদের ঝিলিক, শিউলিঝরা আঙিনা আর বাতাসে ভাসমান মধুর ঢাকের ধ্বনি—আনয়ন করে মর্ত্যলোকে দেবীর বোধনবার্তা।

সুদূর পরবাসে, সাউথ ইয়র্কশায়ারের এই শ্যামল প্রান্তর যখন শরতের কাঁচা সোনায়ে রাঙিয়া ওঠে, তখন ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হইতে হয় যে আমরা স্বদেশের সীমানা হইতে বহুদূরে। ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের শুভক্ষণে যে ক্ষুদ্র আশার প্রদীপখানি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, আজ সাড়ে তিন দশকেরও অধিক সময় পার করিয়া তাহা এক মহৎ আনন্দযজ্ঞে পরিণত হইয়াছে। এলসেকারের মিল্টন হল (Milton Hall) আজ আর কেবল এক ইট-পাথরের সাধারণ আলায় নহে— তাহা প্রবাসে বাঙালির হৃদয়াবেগ, সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও সনাতন সংস্কৃতির এক পরম তীর্থক্ষেত্র।

আমাদের এই বার্ষিক অর্ঘ্য— ‘কাশফুল’। ইহা কেবল মুদ্রিত পত্রমালার সমাহার নহে; ইহা প্রবাসজীবনের উঁকি দেওয়া নস্টালজিয়া, প্রাজ্ঞজনদের চিন্তার আলোড়ন এবং আমাদের অনুজদের অনাবিল ভাবুকতার এক অনবদ্য দর্পণ। সম্পাদক মণ্ডলী ও লেখনী-সাধকদের নিরলস প্রচেষ্টায় এই সংকলনটি সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

এই সুবৃহৎ উৎসব কোন একক নায়কের কৃতিত্ব নহে; ইহা এক সম্মিলিত সাধনা। যাঁহারা নেপথ্যে থাকিয়া প্রদীপ-জ্বালানির ন্যায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন— সেই কার্যনির্বাহী কমিটি ও তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদিগকে জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা। ধন্য আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও স্পন্সরবৃন্দ, যাঁহাদের উদার হস্ত এই উৎসবকে প্রতি বছর প্রাণবন্ত রাখে। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি বার্নসলে পৌরসভা ও স্থানীয় গুণীজনদিগকে, যাঁহাদের সহমর্মিতা আমাদের পরবাসকে স্বদেশের ন্যায় উষ্ণতা দান করিয়াছে।

আসুন, শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পাঞ্জলিতে মহাশক্তিকে বরণ করি। ভেদাভেদ বিস্মৃত হইয়া অঞ্জলি দিই, প্রসাদ বন্টন করি, এবং আসন্ন বিজয়া সন্মিলনীর গীতিময় সন্ধ্যায় একত্রিত হই।

মহামায়া দুর্গার অভয়হস্তে বিশ্ব হইতে সমস্ত অশুভ শক্তি বিলীন হউক; আপনাদের প্রত্যেকের গৃহ স্বাস্থ্যে, শান্তিতে ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠুক।

শারদীয় প্রীতি, শুভেচ্ছা বিজয়ানন্দ

অংশুমান ও সঞ্জয়

Editor's Address

It is a great privilege to present *Kaashphool* 2026, the annual journal of the Sheffield and District Bengali community.

Kaashphool is more than a Puja magazine. It is a reflection of who we are – our stories, creativity, memories, achievements and, above all, our community spirit.

This edition brings together voices from different generations and backgrounds. Through its stories, poems, reflections, photographs and community features, we hope it captures the richness of our shared journey and the wonderful diversity within our community.

For us, one of the most important purposes of *Kaashphool* is to connect generations. We want our children and young people not only to read our magazine, but to see themselves in it, contribute to it and, one day, become its custodians. Our heritage can only remain alive when it is shared, celebrated and carried forward.

We would like to thank everyone who has contributed to this edition, and all those who give their time and energy to our community throughout the year. Every contribution, large or small, helps make *Kaashphool* what it is.

We hope that, as you turn these pages, you will find something that makes you smile, something that inspires you, and perhaps something that brings back a cherished memory.

Most importantly, we hope you finish reading it with a simple feeling:

“I am proud to be part of this community.”

Celebrating Our Heritage. Inspiring Our Future.

Indrila and Sandip

Editor, Kaashphool 2026

Acknowledgements:

Our sincere thanks to Lopa Das for her careful proofreading and valuable support in preparing this magazine.

We would also like to acknowledge the members who generously shared photographs, as well as the photographs sourced from Google and used in this publication.

MEET THE COMMITTEE



Abhay Das
Chairman



Victor Palit
Vice Chairman



Sanjay Ghoshal
Secretary



**Anshuman
Sengupta**
Asst Secretary



**Samujjwal
Basu**
Treasurer



Sharmistha Bal
Asst Treasurer



Sudipta Samanta
Cultural
Secretary



Rajasee Basu
Asst Cultural
Secretary



Rupak Sarkar
Communications
Secretary

ADVISORY COMMITTEE



Subhasis Duttagupta



Rama Rana



Chandan Biswas

PUJA MAGAZINE EDITORS



Indrila Ghoshal



Sandip Samanta

COME, JOIN US

Annual Subscription of £135

Bank Account Name: Sheffield District Durgotsab

Bank Name: HSBC

Sort Code: 403201

Account No: 41433288

Please visit the Facebook page: <https://www.facebook.com/SheffieldDurgapuja>

Please visit the website: <https://barnsleypuja.net>



SDDCC Members

Mr Rohit Abrol & Dr Anneka Biswas-Abrol	Mrs Esita Pramanik
Dr Gautam Bal & Mrs Sharmistha Bal	Dr Piyush Prashar & Mrs Rituparna Prashar
Mr Samvarta Bandyopadhyay & Mrs Runa Bandyopadhyay	Dr Arup Rana & Mrs Rama Rana
Dr Dibyendu Banerjee & Mrs Aditi Banerjee	Dr Jaydip Ray & Dr Karabi Ray
Mrs Karabi Banerjee	Dr Kaustabh Raychaudhuri & Mrs Dena Roychaudhuri
Dr Amit Banerjee & Mrs Sangita Banerjee	Mr Rhijubrata Saha & Mrs Lopa Bandyopadhyay
Dr Subhajit Basu & Mrs Milly Basu	Mr Sandip Samanta & Mrs Sudipta Samanta
Mrs Julia Basu	Dr Sugato Sarkar
Mr Samujjwal Basu & Mrs Sinjini Basu	Mr Susovan Sarkar & Mrs Neepa Bandopadhyay
Dr Monotosh Bhadra & Dr Sipra Bhadra	Mr Subir Sen & Dr Sangeeta Ray
Dr Chandan Biswas & Dr Sheela Biswas	Dr Soumya Sankar Basu & Mrs Rajasee Basu
Dr Abhijit Chakraborty & Mrs Barnali Chakraborty	Dr Sanjay Basu & Dr Mohua Basu
Dr Mallikha Chakraborty	Mr Somnath Saha
Mr Kamal K Chakrobarti & Mrs Swapna Chakrobarti	Mr Rohit Biswas & Mrs Souradipa Das
Dr Shyamal Chatterjee & Mrs Sunanda Chatterjee	Dr Rupak Kumar Sarkar & Dr Ranjana Sarkar
Dr Chinmoy Chaudhuri & Dr Kabita Chaudhuri	Mr Atul Bhaskar & Dr Ipsita Roy
Mr Pradip Chongder & Mrs Swati Chongder	Mr Angshuman Sengupta & Mrs Surovi Sengupta
Dr Abhay Das & Dr Lopa Das	Dr Kamal Samanta & Dr Renuka Samanta
Dr Rajarshi Das & Mrs Sudipa Das	Dr Soumitra Dutta & Mrs Binita Dutta
Dr Prabal Datta & Mrs Mousumi Datta	Dr Suman Bhattacharya & Mrs Aditi Bhattacharya
Dr Manas Debbarman & Mrs Anindita Biswas	Dr Ranadeb Acharya & Mrs Susmita Acharya
Mrs Dipali Dutta	Dr Nabakumar Basu & Dr Rakhi Basu
Dr Subhasis Duttagupta & Mrs Sutapa Duttagupta	Mr Gayatri Pandey & Mrs Krishna Pandey
Dr Pancho Ghatak & Mrs Baisali Ghatak	Dr Buddhadeb Jana & Mrs Sanchita Paul Jana
Dr Adwaita Ghosh & Mrs Sudipta Ghosh	Mr Tirthankar Chokroborty & Mrs Isihta Chatterjee
Dr Subrato Ghosh & Dr Anuradha Ghosh	Dr Kaushik Lahiri & Dr Munmun Lahiri
Dr Sanjay Ghoshal & Mrs Indrila Ghoshal	Dr Piya Dhar & Dr Vinayak Kumar
Dr Prosenjit Giri & Dr Anuradha Giri	Dr Manas Mallik & Mrs Sheila Mallik
Ms Devjani Mitra	Dr Kiran Pindiprolu & Dr Rama Satya Garikipati Pindiprolu
Mr Sumanta Ray & Mrs Payal Paul	Dr Sabyasachi Chatterjee & Dr Shobha Somashekhar
Mr Arnab Kundu & Mrs Amrita Pradhan	Dr Arindom Aich & Mrs Debjani Aich
Dr Anil Kumar Mandal & Mrs Sumitra Mandal	Dr Syamalendu Bandyopadhyay & Mrs Pali Bandyopadhyay
Mr Suwendu Mandal & Mrs Sheuli Mandal	Dr Sumit Pakrashi & Mrs Dipika Shukla
Dr Satyendu Mitra & Mrs Rina Mitra	Mr Deepayan Datta & Dr Asitama Sarkar
Dr Shibopriyo Mukherjee & Dr Manjusree Mukherjee	Dr Kalyan Seelam & Dr Leela Seelam
Mr Sujit Mukherjee & Dr Tapati Mukherjee	Dr Vikas Giroti & Dr. Arpita Ganguly
Dr Victor Palit & Dr Susmita Ray	

SDDCC AGM Summary 2026

Venue: Milntonton Hall, Elsecar, Barnsley

Date: 10.05.2026

Time: 1:00 pm to 18:15 pm

Agenda Points	Discussion	Responsibility
Legalisation of SDDCC constitution	EC to finalise SDDCC constitution as a non charitable organisation, circulate it to all members for comments and finally legalise the constitution.	EC to act accordingly
Charitable vs Non-charitable organisation	SDDCC will remain a non-charitable organisation	Suggested by EC, Agreed by AGM
Poor state of maintenance of Milton Hall	New EC to contact Milton Hall authority and raise the issue formally	EC to act accordingly
GDPR issues	Message disclaimer to give during cultural program and during puja regarding sharing pictures and performance on social media.	EC to act accordingly
Mistake in previous audit report, difficulty in contacting the auditor to correct the report	To change the auditor	EC to act accordingly
Membership fees and food coupon price	Proposal from treasury to increase the membership fees to 135 pounds and food coupon price to 3.50 pounds. Accepted by the members present in AGM	EC to act accordingly
Advance cash payment to cultural team	Cash payment of a limited amount can be handed out to the cultural team if required	EC to act accordingly
Voting rights for the advisors	If EC is unable to decide on something, then the unanimous decision of AC will be binding on EC.	Constitution needs to be amended to reflect above. EC to act accordingly
Face-to-face and online voting method	The AGM has agreed to allow both face-to-face and online voting methods for future elections	EC to deliberate and decide on which online platform to use.

SDDCC Financial Statement

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE

INCOME	General Purposes	Contingency Reserve	Total 2026
Annual Subscription	£8,875		£8,875
Microsponsorship	£3,279		£3,279
Puja Stall	£445		£445
Advertisement	£900		£900
Gate Collection	£5,289		£5,289
Puja Pronami	£439		£439
Food Coupon	£464		£464
Dashami Mahabhoj Income	£680		£680
External Artists Event Income	£9,340		£9,340
Misc Income	£75		£75
Noboborsho Income	£520		£520
Interest Income		<u>£501</u>	<u>£501</u>
TOTAL INCOME	<u>£30,306</u>	<u>£501</u>	<u>£30,807</u>
EXPENDITURE			
External Artists Event Expenses	£8,600		£8,600
Puja Expenses	£8,024		£8,024
Admin Expenses	£581		£581
Bank Charges	£87		£87
Misc Expenses	£100		£100
Dashami Mahabhoj	£675		£675
Noboborsho Expenses	£3,669		£3,669
Rent	£4,411		£4,411
Prepared Food	£393		£393
Flowers	£597		£597
Cutlery	£815		£815
Magazine Printing	£627		£627
AGM Venue	<u>£100</u>		<u>£100</u>
TOTAL EXPENDITURE	<u>£28,679</u>		<u>£28,679</u>
INCOME SURPLUS	<u>£1,627</u>	<u>£501</u>	<u>£2,128</u>

ACCOUNTS

BALANCE SHEET AS AT 10TH MAY 2026

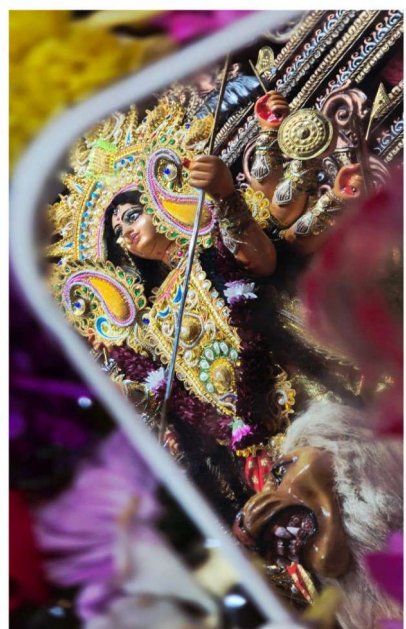
	General Purposes	Contingency Reserve	Total
ASSETS			
Current Account	£5,435		£5,435
Deposit Account		<u>£32,922</u>	<u>£32,922</u>
TOTAL CASH AT BANK	<u>£5,435</u>	<u>£32,922</u>	<u>£38,357</u>
TOTAL CURRENT ASSETS	<u>£5,435</u>	<u>£32,922</u>	<u>£38,357</u>
TOTAL NET ASSETS	<u>£5,435</u>	<u>£32,922</u>	<u>£38,357</u>
Represented by:			
RESERVES AT 10 th MAY 2025	£3,808	£32,421	£36,229
Income Surplus	<u>£1,627</u>	<u>£501</u>	<u>£2,128</u>
RESERVES AT 10 th MAY 2026	<u>£5,435</u>	<u>£32,922</u>	<u>£38,357</u>

Approved by the Committee of Management



..... (Treasurer)

31/08/2026





SHARED SMILES



Like every beautiful journey, our last year unfolded through moments of faith, music, laughter, friendship and togetherness. As a community, we once again came together to celebrate the festivals that bind us to our roots and, at the same time, create beautiful memories. Our journey began with Durga Pujo, when the familiar fragrance of dhuno, the sound of dhaak and the chants of “Ya Devi Sarvabhuteshu” brought Ma Durga into our midst. From the solemnity of the puja and anjali to the warmth of bhog- bitoron, every moment was filled with devotion and joy. Families came together, children participated with enthusiasm, and our community space truly felt like a little piece of Bengal.

The festive spirit continued through Sasthi, Saptami, Ashtami, Nabami and Dashami. On Sasthi, our little ones looked absolutely adorable in their traditional pujar saaj. Saptami came alive with a vibrant flash mob, while Ashtami brought the sacred beauty of Sandhi Pujo, followed by an energetic and joyful Dhunuchi -Naach. Nabami continued the celebrations with Dandia. Finally, Dashami brought a beautiful blend of emotion and celebration with Sindur-Khela, as we bid farewell to Ma Durga. Alongside the celebrations, the shared experience of ek - sathe-ranna, preparing and sharing food, and enjoying bhog together made the Pujo feel less like an event and more like a gathering of one big family. And then the celebrations continued, Lakshmi Pujo, Kali Pujo and Saraswati Pujo, each carrying its own beauty, devotion and significance. Every festival gave us another reason to come together. Our cultural journey continued with Surer Sandha, another beautiful celebration of music and the artistic spirit that brings us together. Our journey then reached another beautiful milestone with Nobo Borsho, where tradition met talent and the spirit of Bengal came alive on stage. The inauguration set the tone for an evening filled with music, drama and emotion. The soulful rendition of “Sangacchadhwaam”, enriched by the timeless magic of Rabindranath Thakur, was a perfect beginning to the Bengali-New-Year. Our Sheffield wonder kids truly stole the show, reminding us once again that our culture is in safe and beautiful hands by performing a Dance Drama, based on a famous poem by Sri Sunirmal Basu...Sobar Ami Chatra. The celebration also paid tribute to the legendary Mahanayak Uttam Kumar on his birth centenary through Sruti Natok. “Phool Phutuk Naa Phutuk” touched hearts with its heartfelt narration.

The evening became even more vibrant with the Movers & Shakers from Leeds, followed by Adi Surja’s inspiring vocal performance. And, of course, the suspense and excitement of the natok kept everyone captivated until the very end. Looking back, it was truly an incredible year. Most importantly, it was a year of togetherness and perhaps that is the most beautiful thing about these celebrations: wherever life takes us, when we gather together, our roots always find their way home.

Indrila

“অভিনন্দন”

মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়



আমাদের SDDCC দীর্ঘ ৩৭ বছর পর অভিনন্দিত হয়েছে একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে!

গত ৩১শে মে ২০২৬ এ Manchester Wythenshaw Forum Hall এ Manchester Boisakh Festival (ম্যানচেস্টার বৈশাখ উৎসব) আয়োজিত হয়েছিল, KARISYO EVENTS LTD এর তত্ত্বাবধানে। এই প্রতিষ্ঠানের দুই কর্ণধার শ্রীমতী ভাবনা ঘোষ প্যাটেল ও শ্রী তুণীর ঘোষ এই সুন্দর অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করেছিলেন।

এই যুক্তরাজ্যের আরও কিছু প্রতিষ্ঠান যাঁরা একাগ্রতার সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে মা দুর্গার আরাধনা করে আসছেন, যেমন লিভারপুল, লিডস, ওয়েলস ইত্যাদি শহরের দুর্গাপূজা কমিটির প্রতিনিধিদেরও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আমি এবং শিবপ্রিয় মুখোপাধ্যায় SDDCC র অন্যতম Founder Member. মা দুর্গার আরাধনায় প্রথম দিন থেকে যুক্ত থাকার সুবাদে SDDCC র প্রতিনিধি হিসেবে এই অভিনন্দন গ্রহণ করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল।

মঞ্চঃ দাঁড়িয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিলো দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে মায়ের আরাধনার ছবি। সেই ৫ই অক্টোবর ১৯৮৯ (5/10/1989) দুর্গা ষষ্ঠীর দিনটিতে শেফিল্ড হিন্দু মন্দিরে প্রথম পূজা আরম্ভ হয়েছিল। যাঁদের সঙ্গে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম, যাঁদের একাগ্রতা, ভক্তি ও শ্রমের মিলিত সংযোগে এই প্রতিষ্ঠান আজ যুক্তরাজ্যে এবং সুদূর কোলকাতাতেও পরিচিতি পেয়েছে—তাঁদের সবার কথা মনে পড়ছিল। যাঁরা আমাদের মধ্যে আর নেই তাঁদের উদ্দেশ্যে মনে মনে প্রণাম জানাচ্ছিলাম।

মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করছিলাম যেন আমাদের পরের প্রজন্মও এই ভাবে ভক্তি ও নিষ্ঠার সাথে, সবার সঙ্গে মিলে মিশে মায়ের আরাধনা করে যেতে পারে, আর পূজা ছাড়াও যেহেতু এটি একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ, তাই আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির সক্রিয় চর্চাও যেন তারা বজায় রাখতে পারে এবং আগামী তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।



An Experience to Remember

During 2025 Durga Pujo, I had the opportunity to be the Kumari, for the Kumari Pujo. Mummy said that I would be worshipped as Ma Durga. I felt happy and excited and also a little nervous at the same time. On the day, we reached Milton Hall early to get ready in time. Mummy and her friends dressed me up in a beautiful Banarasi saree and loads of jewellery. When I was ready, Daddy carried me to the stage and sat me down on a pink sofa in front of Ma Durga. The Priest started performing the rituals. He also put a crown made out of flowers on my head. I felt like a queen. I had to sit patiently for a long time. The whole time everyone was taking photos of me. Some of them also touched my feet for blessings, although they were much older

than me. I did not understand all the rituals, but everyone was showing me a lot of respect, and I felt very important. At the end, Daddy carried me down again from the stage into the room next door where I changed into a new set of clothes. It was a unique experience, and I feel very grateful to have been given this opportunity.

Toshaani Sarkar

Year 4.

কাশফুল আমার খুব প্রিয়। এই ফুলের একটি আলাদা আবেদন আছে, যা শরৎকালে মায়ের আগমনীর বার্তা বয়ে আনে। এই ফুল শুধু মানুষের নয়, দেবতাদেরও প্রিয়। সবচেয়ে উর্দ্ধ মুখী এই ফুল শরৎকালে ফুটে যেন দেবতাদের আত্মনাকে জানায়। শরৎকালের আর একটি বিশিষ্ট ফুল শেফালি বা শিউলি মাটিতেই ঝরে পড়ে। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণের সপ্তদশ অধ্যায়ে বিষ্ণু/নারদ সংবাদে এই কাশফুল কে “মেঘ মালা” পুষ্প বলে বর্ণনা করা হয়েছে!! শরৎকালের মেঘের মতোই শুভ্র এবং হালকা। বিষ্ণুকে জিজ্ঞেস করে নারদ জানলেন এই মেঘ মালা পুষ্প প্রথম “বৃন্দাবনে” আবিষ্কৃত হয়। সত্যযুগে লক্ষ্মী রূপিনী বৃন্দা দেবী বহু বছর তপস্যার পর যখন তাঁর দেহ ক্ষয় বা বিলীন হয়েছিল, তখন তাঁর অস্থি থেকে কাশফুল জন্মেছিল। সেজন্যই হয়তো কাশফুলের ডাঁটিগুলি খুবই শক্ত পোক্ত! পরে এই তপস্যা স্থানের নাম হয় “বৃন্দাবন”—দ্বাপর যুগে শ্রী কৃষ্ণের লীলা ক্ষেত্র।

আগেই বলেছি প্রথম দিকে আমাদের SDDCC-র অর্থ ভাণ্ডার তেমন সমৃদ্ধ ছিল না, তাই দুর্গাপূজার মন্ডপ সাজানোর জন্য কোনো বাজেট বরাদ্দ ছিল না। তখন আমরা শুধু মাত্র কাশফুল দিয়ে মণ্ডপ সাজিয়েছি। আমার একটি পারিবারিক ছবি দিচ্ছি, তাতে দেখা যাচ্ছে মন্ডপের এক পাশে কাশফুলের গুচ্ছ রয়েছে। আমার অনুরোধে আমাদের জগদীশ দা, ডা: জগদীশ বোস তাঁর বাগান থেকে প্রতি বছর প্রচুর কাশফুল বৃষ্টি পড়ে নষ্ট হবার আগেই কেটে রাখতেন। এই ছবিতে মায়ের পিছনের সজ্জাটি শুধু মাত্র কয়েকটি সাদা ও রঙিন কাপড়ের সমন্বয়। এই রকম করে অল্প খরচে মন্ডপ সাজানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন শিবপ্রিয় মুখার্জি। এই কাপড়গুলি শ্রী অমরনাথ ঘোষ (আমাদের আগের ঠাকুরের নির্মাতা) উপহার হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। এখন SDDCC-র অর্থের আনুকূল্যে পুরো হল এবং পূজা মন্ডপটি সুন্দর করে সাজানো হয় আমাদের সকলের সুরুচিপূর্ণ মিলিত প্রয়াসে!



আমাদের ভক্তিপূর্ণ আত্মনাকে মা এসে বিরাজ করেন সেই মন্ডপে। অতি যত্ন সহকারে সংকলিত “কাশফুল” উৎসবের আনন্দকে পূর্ণ করে।

কাশফুল হাতে নিয়ে অনেক দিনের ফেলে আসা স্মৃতিতে দোলা লাগে। শারদোৎসব আরও মূর্ত হয়ে ওঠে প্রতি বছর।।

Kash Phool – The Bloom of Agamoni.

Dr Chandan Biswas.

A decade ago, the **Sheffield & District Durgotsab & Cultural Committee** launched **Kash Phool** magazine to celebrate Durga Puja. Recently, a close colleague from a different faith asked me about the significance of its name. His genuine curiosity inspired me to reflect on the beautiful symbolism of **Kash Phool** and share its meaning with our readers.

Botanically classified as *Saccharum spontaneum* and commonly known in English as Kans grass. **Kash Phool** holds a profound spiritual, aesthetic and historical place in Hindu culture. It grows abundantly along sea banks, river banks, roadsides and open countryside across India, particularly in West Bengal, where its graceful white plumes herald the transition from the monsoon season to autumn. It was introduced to parts of Europe in the late 19th century for agricultural purposes and later as an ornamental landscape grass. For many, the blooming of Kash flower is a cherished symbol of the approaching festive season, especially the arrival of Durga Puja, making it an enduring emblem of nature, tradition, and cultural heritage.

Kash Phool is deeply associated with Durga Puja because it blooms precisely during the festival season, making it a natural herald of autumn and the arrival of the Goddess Durga on earth. Across Bengal and Eastern India, the appearance of its graceful white plumes is traditionally regarded as a sign that **Maa Durga** is on her way to her maternal home, filling people with anticipation, devotion, and festive joy.

According to local folklore and popular belief, Kash flower is considered a messenger and welcoming flower for Goddess Durga, accompanying her symbolic journey from her heavenly abode to earth. It is also closely linked with **Shakti**, the Divine feminine energy, and represents purity, renewal, and the spiritual essence of the season.

The striking contrast of **Kash Phool's** white blossoms against the clear blue skies of Sharad Ritu (**autumn**) has become one of the most enduring visual symbols of the season in Bengal. This iconic landscape has inspired generation of poets, artists, and writers and occupies a prominent place in Bengali literature and cultural memory. Classical descriptions of autumn by **Kalidasa** to the works of modern Bengali authors, Kash flowers have remained an enduring emblem of autumn, devotion, and spirit of Durga Puja. Rooted in a rich culture, literary and religious heritage, the sight of blooming Kash flowers instantly evokes a feeling of nostalgia, reverence, and the joyful anticipation of Durga Puja for countless Bengalis.

The leaves and plumes of Kans (also called Kash or Jans grass) are widely used in rituals and decorations during the festive season. Artisans and decorators use Kans grass plumes to adorn Durga idols, pandal back drops, and festive installations, creating a beautiful visual connection between nature, the Goddess, and the celebration. The blooming of Kans grass marks the end of the monsoon and beginning of the festive season, as it appears reliably at this time every year. It serves as nature's calendar, signalling the arrival of not only Durga Puja but also other autumn festivals and celebrations.

Its delicate, feathery look Kans grass being incredibly resilient. It is a wild perennial grass with deep spreading roots that can survive harsh weather, floods and droughts. It thrives on barren land and sandy river beds where



other plants struggle.

This represents inner strength (**Shakti**) that **Goddess Durga** imparts to her devotees. The ability to remain resilient, stand tall and bloom gracefully even in difficult circumstances.

Kash flowers bloom immediately after the heavy monsoons; it represents the cycle of rebirth and cleansing. The dark storm clouds of the rainy season clear away to reveal bright blue skies and the wild earth responds with a joyful burst of white. **(The picture captures- “Special moments with my granddaughters on the sandy shores of the Maldives”.)**



It is a visual reminder that life renews itself, troubles pass and auspicious beginnings are always on the horizon.

In conclusion, **Kash Phool** holds profound **Spiritual, aesthetic, ayurvedic** and **historical** significance in **Hindu** tradition.

Spiritual significance: The white plume like-flowers are widely regarded as a symbol of purity (**Shuddha**), reflecting the essence of the divine feminine energy. They are also considered a traditional messenger of **Goddess Durga**, heralding her arrival during the festive season. Spiritually, they symbolise renewal, hope, and the triumph of good over evil, reinforcing themes of inner purity, strength and divine grace.

Aesthetic significance: The Ganga becomes the canvas of autumn, with its banks covered in white Kash flowers. The ancient poet **Kalidasa** praised this season in the **Ritusamhara**, describing autumn as a bride dressed in white Kash blossoms.

Rabindranath Tagore often used Kash flowers to express peace, lightness, and the quiet beauty of nature after the monsoon.

In **Satyajit Ray's** *Pather Panchali*, the famous scene of Apu and Durga running through a field of tall Kash flowers to see a steam train beautifully captures childhood wonder, rural innocence and nostalgia. Together, these literary and cinematic works show that Kash flowers are a timeless symbol of autumn in India.

Ayurveda & its Historical Connection: Historically, Kasha has held a valued place in Ayurveda, where it is revered for its naturally cooling properties. Traditionally, it has been used to help alleviate conditions associated with excess heat, including heatstroke, burning sensations and certain skin disorders.

During the autumn season in Vrindavan, the banks of the Yamuna River are said to have been adorned with flourishing **Kash Phool**, their graceful white plumes swaying gently in the breeze. According to the tradition, **Lord Krishna** and the **Gopis** would dance amidst ethereal meadows, celebrating the splendour of the season. It is also believed that **Lord Krishna** would occasionally wear garlands woven from wild autumn grasses and blossoms, symbolising his profound harmony with and appreciation for the beauty of the natural world.

সুরের ভেতর বেঁচে থাকা:

শ্রীকান্ত আচার্য ও জয়তী চক্রবর্তীর সঙ্গে এক দীর্ঘ আলাপ

সাক্ষাৎকার: মিলি বসু

কলমে: ইন্দ্রিলা ঘোষাল

ম্যাগাজিনের কাজ করতে করতে গত এক বছরের ছবিগুলো আবার দেখতে বসেছিলাম। দুর্গাপূজো, লক্ষ্মীপূজো, কালীপূজো, একের পর এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, —প্রতিটা ছবিই যেন এক একটা গল্প শোনাচ্ছিল। সেই সব ছবির ভিড়েই বারবার চোখ আটকে গেল একটা বিশেষ সন্ধ্যায়, সুরের সন্ধ্যা - শ্রীকান্ত আচার্য আর জয়তী চক্রবর্তীর সেই অসাধারণ অনুষ্ঠান। সত্যি বলতে কী, শুধু গান নয়, তাঁদের উপস্থিতিই যেন একটা আলাদা আবহ তৈরি করেছিল। একের পর এক গান, গল্প, হাসি আর দর্শকদের সঙ্গে সহজ মেলামেশা—সব মিলিয়ে সন্ধ্যাটা এখনও যেন টাটকা। তারপর এল তাঁদের ঘরে



ফেরার দিন। কলকাতার ফ্লাইট ধরার আগে বিমানবন্দরে অপেক্ষা করতে করতেই জমে উঠেছিল আর এক দফা আড্ডা। সেই অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় উঠে এলো শ্রীকান্ত আচার্য ও জয়তী চক্রবর্তীর শৈশবের পূজো, গানের হাতেখড়ি, গুরু-শিষ্য পরম্পরা, রবীন্দ্রসংগীতের দর্শন, আধুনিক বাংলা গানের বর্তমান, শিল্পীর সাফল্য-ব্যর্থতার গল্প এবং বাংলা সংস্কৃতিকে ঘিরে তাঁদের গভীর উদ্বেগ ও আশার কথা।

পূজো—শুধু উৎসব নয়, এক অনুভূতির নাম

শ্রীকান্ত আচার্যের কাছে কলকাতার পূজো আর বিদেশের পূজো— দুটো সম্পূর্ণ আলাদা অভিজ্ঞতা। “কলকাতায় পূজোর সময় আমরা সবাই ভীষণভাবে involved থাকি। শুধু আমরা শিল্পীরা নই, সাধারণ মানুষও। একটা বিশাল উন্মাদনা থাকে। আর বিদেশে যখন আসি, তখন একটা উদ্দেশ্য নিয়েই আসি— আমাদের গান শোনানো, মানুষকে আনন্দ দেওয়া। তবে বিদেশের পূজোকে কোনওভাবেই ছোট করে দেখেন না তিনি। বরং প্রবাসী বাঙালিদের আন্তরিকতাই তাঁকে বারবার মুগ্ধ করে। “বিদেশের বাঙালিরা খুব সীমিত resource, সীমিত মানুষ নিয়ে যেভাবে পূজোটা করেন, সেটা দেখে আমার খুব আনন্দ হয়। ওদের ভালোবাসাটা কিন্তু কোনও অংশে কম নয়।”

জয়তী চক্রবর্তীর অনুভূতিও অনেকটাই একই সুরে বাঁধা। তাঁর কাছে কলকাতার পূজো নিখাদ নস্টালজিয়া, আর বিদেশের পূজো তাঁর কর্মজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। “কলকাতার পূজোর সঙ্গে অনেকটা নস্টালজিয়া জড়িয়ে আছে। আর বিদেশের পূজোর সঙ্গে আমার কর্মক্ষেত্রটা directly involved। সেখানে আমি committed। আমি চাই, আমি যেন ভালো কাজ করি, আর মানুষ সেটা ভালোভাবে গ্রহণ করেন। যখন সেটা হয়, তখন অন্যরকম একটা satisfaction আসে।”

একদিকে শিকড়, অন্যদিকে দায়িত্ব— এই দুইয়ের মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতা নেই। বরং দুটিই তাঁদের শিল্পীজীবনের সমান গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

হাওড়ার গলি, পাড়ার পূজো আর গান

আশ্চর্যের বিষয়, দু'জনেরই শৈশব কেটেছে হাওড়ায়। আর সেই কারণেই তাঁদের পূজোর স্মৃতির রংও যেন কোথাও গিয়ে এক হয়ে যায়।

শ্রীকান্ত আচার্যের স্মৃতিতে তখনকার হাওড়া ছিল অনেক বেশি খোলামেলা। আজকের মতো এত ভিড়, এত কংক্রিট ছিল না। দুর্গাপূজো মানেই নতুন জামাকাপড়, বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়া, আর পাড়ার পুজোকে ঘিরে দিন গোনা। মণ্ডপ বাঁধা থেকে প্রতিমা আসা— প্রতিটি মুহূর্তেই ছিল এক আলাদা উত্তেজনা। কিন্তু সেই স্মৃতির সবচেয়ে উজ্জ্বল জায়গা জুড়ে রয়েছে গান। তখন ক্যাসেট বা CD-র যুগ আসেনি। পুজোর আবহ তৈরি হতো গ্রামোফোনের রেকর্ড আর রেডিয়ার সুরে। ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহিষাসুরমর্দিনী, আর দিনের বেলায় প্যাণ্ডেল জুড়ে বাজত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্রদের গান। “ওই গানগুলো শুনেই বড় হওয়া। ওই আমেজটাই অন্যরকম ছিল,” বলেন শ্রীকান্তদা। তাঁর কথায়, একসময় পুজোর গান ছিল বাঙালির বছরের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক অপেক্ষাগুলোর একটি। “পুজোর গানের একটা আলাদা ওয়েট ছিল। বড় শিল্পীদের নতুন গান বেরোনোর জন্য মানুষ চাতক পাখির মতো বসে থাকত। গ্রামোফোনে সেই গান বাজত প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে, আর মানুষের মুখে মুখে ফিরত। এখন অনেক option এসেছে। কিন্তু তখনকার ওই চার-পাঁচটা গানই ছিল আমাদের পুজোর সবথেকে বড় সম্পদ।”

জয়ন্তী চক্রবর্তীর ছোটবেলার পুজোর ছবিটাও যেন সেই একই সময়ের আর-এক ফ্রেম। হাওড়ার পৈতৃক বাড়িতে তাঁদের নিজেদের বাড়িতে পুজো হতো না। কিন্তু পাড়ার পুজোই ছিল তাঁদের উৎসবের কেন্দ্র। “যখন থেকে বাঁশ বাঁধা শুরু হতো, তখন থেকেই আমাদের পুজো শুরু হয়ে যেত। আমরা বন্ধুবান্ধবরা বাঁশ ধরে ঝুলছি, লুকোচুরি খেলছি, কুমিরডাঙা খেলছি— আর একটার পর একটা গান বাজছে। সেই গান শুনতে শুনতেই বড় হয়ে ওঠা।”

সবচেয়ে বেশি যা তাঁকে টানে, তা হল সেই সময়ের গানের বৈচিত্র্য। “ছোটবেলায় সকালবেলা রবীন্দ্রনাথের গান বাজত। একটু বেলায় দিকে বাংলা আধুনিক, বিকেলে সিনেমার গান, আর রাতের দিকে হিন্দি গান। এই যে একটা বিভাজন ছিল, তাতেই বিভিন্ন ধরনের গান শোনার অভ্যাস তৈরি হয়েছিল।”

তারপর একটু থেমে যেন আক্ষেপের সুরেই বলেন— “এখন অন্তত আমি যেখানে থাকি, দেখি একই দশটা গান সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাজছে। দশটা শেষ হলে আবার এক নম্বর থেকে শুরু। আমাদের সময়টা কিন্তু এরকম ছিল না। তাই সেই দিনগুলোকে খুব মিস করি, ভীষণ মিস করি।”

গান শোনার মধ্যেই তৈরি হয় শিল্পী

দুই শিল্পীর সংগীতজীবনের শুরু দুটি ভিন্ন পথে হলেও, একটি জায়গায় এসে মিলে যায়—‘শোনা’।

শ্রীকান্ত আচার্য জানান, তাঁর পরিবারে পেশাদার সংগীতশিল্পী না থাকলেও গান শোনার পরিবেশ ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ছোটবেলায় তিনি অসংখ্য গান শুনেছেন। সেই শ্রবণই তাঁর ভিত তৈরি করেছে। পরে দক্ষিণীতে রবীন্দ্রসংগীত শেখার মাধ্যমে তিনি বুঝেছেন শৃঙ্খলা, স্বর, তাল এবং গানের গভীরতা। তাঁর মতে, গান শুধু সুর নয়—বাণীকেও সমান গুরুত্ব দিতে হয়। একজন শিল্পীর কাজ শুধু সুন্দর গাওয়া নয়, গানের কথার প্রতি ন্যায়বিচার করা।

অন্যদিকে জয়ন্তী চক্রবর্তীর সংগীতশিক্ষা শুরু মাত্র পাঁচ বছর বয়সে। একের পর এক গুরুর কাছে তালিম, খেয়াল, নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসংগীত—সব মিলিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তাঁর সংগীতজীবনের ভিত। কিন্তু তিনি অকপটে স্বীকার করেন, শুধু গান শেখাই তাঁকে শিল্পী বানায়নি; রবীন্দ্রনাথকে পড়া, বোঝা এবং অনুভব করার মধ্য দিয়েই তিনি সত্যিকারের রবীন্দ্রসংগীতকে ভালোবাসতে শিখেছেন। তাঁর ভাষায়, রবীন্দ্রসংগীত কেবল স্বরলিপি মেনে গাওয়ার বিষয় নয়। শব্দকে বিশ্বাস করতে হয়, ধারণা করতে হয়। সেই বিশ্বাস থেকেই জন্ম নেয় প্রকৃত পরিবেশন।

তাঁদের কাছে সংগীত পেশা হওয়ার আগে সাধনা; সাফল্য পাওয়ার আগে আত্মঅন্বেষণ।

সাফল্যের পিছনে প্রতিভা, পরিশ্রম... নাকি ভাগ্য?

আজকের দিনে অসংখ্য reality-show নতুন নতুন শিল্পীর জন্ম দিচ্ছে। অসাধারণ প্রতিভাবান বহু তরুণ-তরুণী চোখের সামনে উঠে আসছেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—সকলেই কি সমান সুযোগ পান? কেন কেউ রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন, আবার সমান বা তার থেকেও বেশি যোগ্য কেউ হারিয়ে যান ভিড়ে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শ্রীকান্ত আচার্য অত্যন্ত সৎ এবং বিনয়ী। তাঁর মতে, প্রতিভা ও পরিশ্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সাফল্যের সমীকরণে আরও একটি অদৃশ্য উপাদান রয়েছে—ভাগ্য। জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দেখেছেন, অনেক শিল্পীর অসাধারণ কণ্ঠ, নিরলস সাধনা

এবং অবিশ্বাস্য অধ্যবসায় থাকা সত্ত্বেও কাক্ষিত স্বীকৃতি আসেনি। আবার এমনও হয়েছে, একটি মাত্র সুযোগ একজন শিল্পীর জীবন আমূল বদলে দিয়েছে। সেই মুহূর্তটি কখন, কোথায়, কীভাবে আসবে—তার কোনো নির্ভুল ব্যাখ্যা নেই। এই প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করেন কিংবদন্তি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে। নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের উদ্দেশে হেমন্তবাবুর সহজ অথচ গভীর উপদেশ ছিল—নিজের কাজ করে যাও। নাম বা খ্যাতির পেছনে ছুটলে তা অধরা থেকে যায়। কারণ জনপ্রিয়তা কখনও সম্পূর্ণ নিজের হাতে থাকে না। এই দর্শন আজও শ্রীকান্ত আচার্যের শিল্পীজীবনের অন্যতম ভিত্তি।

গুরুর কাছে শেখার কোনো বিকল্প নেই

নিজেকে কখনও পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষিত শিল্পী বলে দাবি করেন না শ্রীকান্ত আচার্য। বরং অকপটে স্বীকার করেন, তাঁর শিক্ষার পরিধি সীমিত। দক্ষিণীতে রবীন্দ্রসংগীতের তালিম তাঁকে গানের ভিত গড়ে দিয়েছে, কিন্তু তিনি মনে করেন সংগীতকে বৃহত্তর অর্থে জানতে হলে শাস্ত্রীয় সংগীতের গভীর সাধনার বিকল্প নেই। তিনি বলেন, শাস্ত্রীয় সংগীত একজন শিল্পীর কণ্ঠকে শুধু সমৃদ্ধ করে না, তাকে বহুমাত্রিক করে তোলে। স্বর, অলঙ্কার, কণ্ঠের নমনীয়তা—সবকিছুর বিস্তার ঘটে নিয়মিত তালিম ও রেয়াজের মাধ্যমে। নিজের সীমাবদ্ধতার কথাও তিনি নিঃসংকোচে স্বীকার করেন। “আমি কী পারি, সেটা যেমন জানি, কী পারি না—সেটাও জানি।”- এই আত্মসমালোচনার মধ্যেই যেন ধরা পড়ে তাঁর শিল্পিসত্তার সত্যতা।

রবীন্দ্রসংগীত: শুধু স্বরলিপি নয়, এক বিশ্বাস

জয়ন্তী চক্রবর্তীর কাছে রবীন্দ্রসংগীত শুধুমাত্র গাওয়ার বিষয় নয়; এটি এক অন্তর্গত যাত্রা। তিনি মনে করেন, স্বরলিপি কেবল একটি কাঠামো মাত্র। গানকে সত্যিকার অর্থে জীবন্ত করে তোলে তার বাণী, তার দর্শন এবং শিল্পীর বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথকে না পড়ে, তাঁর ভাবনা না বুঝে শুধুমাত্র সুর মেনে গান গাওয়া সম্ভব হলেও, সেই গান কখনও প্রাণ পায় না। জয়ন্তীরদির মতে, একজন শিল্পীকে শব্দ শুধু উচ্চারণ করলেই হয় না; শব্দকে ধারণ করতে হয়। শ্রোতার কাছে গান তখনই পৌঁছায়, যখন শিল্পী নিজে সেই বাণীতে বিশ্বাস করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রসংগীতের তথাকথিত ‘গায়কী’ নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ মত প্রকাশ করেন। সুচিত্রা মিত্র ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়—দু’জনের গাওয়ার ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন, অথচ দু’জনেই সমানভাবে কালজয়ী। সুতরাং রবীন্দ্রসংগীতের কোনো একমাত্র গ্রহণযোগ্য গায়নরীতি নেই। প্রয়োজন একটাই—রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁর সৃষ্টির প্রতি সত্যতা এবং নিজের অনুভবকে সত্য করে তোলা।

ফিউশন বনাম মৌলিকতা

আজকাল রবীন্দ্রসংগীতের নানা ধরনের fusion, পুনর্নির্মাণ এবং পরীক্ষানিরীক্ষা নিয়ে প্রায়ই বিতর্ক হয়। এই প্রসঙ্গে জয়ন্তীর অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি পরীক্ষার বিরোধী নন, কিন্তু বিশ্বাস করেন, নিজস্বতা প্রকাশ করার নামে মূল সৃষ্টির আত্মাকে আঘাত করা উচিত নয়। রাগাশ্রয়ী রবীন্দ্রসংগীত গাইতে গেলে রাগের প্রদর্শন নয়, রাগের নির্যাসটুকুই যথেষ্ট। কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেও রাগকে অবিকল অনুসরণ করেননি; তিনি তার রস গ্রহণ করে নিজের সৃষ্টিকে নির্মাণ করেছেন। শিল্পীর কাজ সেই সৃষ্টিকে নতুন করে নিজের দক্ষতার প্রদর্শনী বানানো নয়, বরং একজন মহান স্রষ্টার ভাবনাকে সৎভাবে শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেওয়া। নিজের ভাষায় তিনি বলেন, তিনি নিজেকে একজন ‘মাধ্যম’ হিসেবেই দেখতে ভালোবাসেন।

গান, সংসার এবং অবলম্বনের গল্প

একজন শিল্পীর মঞ্চের আলো যতটা দৃশ্যমান, তার নেপথ্যের মানুষগুলো ততটাই অদৃশ্য। শ্রীকান্ত আচার্যের জীবনে সেই মানুষটি তাঁর স্ত্রী অর্ণা। নিরাপদ চাকরি ছেড়ে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত সংগীতজীবনে ঝাঁপ দেওয়ার সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বড় সমর্থন এসেছিল তাঁর কাছ থেকেই। শ্রীকান্তদা বিশ্বাস করেন, সেই মানসিক শক্তি না থাকলে তাঁর শিল্পীজীবন হয়তো এই জায়গায় পৌঁছত না। অর্ণা নিজেও একজন দক্ষ গীতিকার। ‘বৃষ্টি পায় পায়’ কিংবা ‘আমার জানলা খোলা দেখে’—বাংলা আধুনিক গানের জনপ্রিয় কিছু সৃষ্টি তাঁরই লেখা।

অন্যদিকে জয়তী চক্রবর্তী অকপটে স্বীকার করেন, তাঁর পেশাদার শিল্পীজীবনের অন্যতম স্থপতি তাঁর স্বামী বিক্রম। গানকে ভালোবাসতেন তিনি সবসময়ই, কিন্তু সেই ভালোবাসাকে মানুষের সামনে পৌঁছে দেওয়া, সংগীতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার সাহস তিনিই দিয়েছিলেন। জয়তী দির ভাষায়, “আমি শুধু নিজের জন্য গান গেয়ে সুখী ছিলাম। বিক্রম আমাকে বুঝিয়েছিল, সেই আনন্দ অন্য মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মধ্যেও এক অন্যরকম পরিপূর্ণতা আছে।”

একজন শিল্পীর সাফল্যের নেপথ্যে তাই শুধু একজন শিল্পী নন, থাকেন আরও অনেক মানুষ—যাঁরা নীরবে শক্তি জোগান, সাহস দেন এবং স্বপ্ন দেখতে শেখান।

শ্রোতা থেকে দর্শক—আমরা কী হারাচ্ছি?

কথোপকথনের এক পর্যায়ে শ্রীকান্ত আচার্যের কণ্ঠে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল এক শিল্পীর দীর্ঘদিনের উদ্বেগ। আজকের প্রযুক্তিনির্ভর সময়ে আমরা কি সত্যিই গান শুনছি? নাকি শুধু দেখছি? তিনি বলেন, একসময় গান শুনতে মানুষ অডিটোরিয়ামে আসতেন। আলো নিভে যেত, শ্রোতা চোখ বন্ধ করে সুরের ভেতর ডুবে যেতেন। আজ সেই দৃশ্য বদলে গেছে। মঞ্চে শিল্পী ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শত শত মোবাইল ফোন উঠে আসে। যেন গান শোনার চেয়ে গানটিকে রেকর্ড করাটাই বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে। “আমরা সবাই এখন ভিউয়ার হয়ে গেছি, লিসনার আর নেই”—এই একটি বাক্য যেন বর্তমান সময়ের সাংস্কৃতিক সংকটকে এক নিঃশ্বাসে ব্যাখ্যা করে দেয়। তাঁর মতে, গানকে অনুভব করার জন্য যে মনোযোগ, যে ধৈর্য এবং যে নিবেদন প্রয়োজন, তা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দ্রুতগতির অভ্যাস আমাদের মনোযোগের পরিসরকে সংকুচিত করেছে। একটি দীর্ঘ আলাপ, একটি দেড় ঘণ্টার কনসার্ট, এমনকি একটি পূর্ণাঙ্গ গানও এখন অনেকের কাছে বিলাসিতা। যেখানে পনেরো মিনিটের একটি পডকাস্ট শেষ পর্যন্ত শোনা আজ ‘রেকর্ড, সেখানে চার মিনিটের একটি গানও প্রথম কয়েক সেকেন্ডেই বিচার হয়ে যাচ্ছে। একজন শিল্পীর কাছে এর চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আর কীই বা হতে পারে?

ভালো গানের অভাব, না ভালো গানের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব?

বর্তমান বাংলা গানের প্রসঙ্গে শ্রীকান্ত আচার্যের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সাহসী। তিনি মনে করেন, আজও অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পীর অভাব নেই। রিয়্যালিটি শো থেকে বেরিয়ে আসা বহু তরুণ-তরুণীর কণ্ঠ তাঁকে বিস্মিত করেছে। কিন্তু প্রশ্ন অন্য জায়গায়। তাঁদের গাওয়ার জন্য কি যথেষ্ট ভালো গান তৈরি হচ্ছে? একজন শিল্পীর কণ্ঠ যতই প্রশিক্ষিত হোক, যদি তার হাতে দুর্বল সুর বা দুর্বল কথা তুলে দেওয়া হয়, তাহলে সেই প্রতিভার যথাযথ বিকাশ সম্ভব নয়।

তিনি আক্ষেপ করে বলেন, আমরা আজ অনেক সময় মাঝারি মানের সৃষ্টিকেও অসাধারণ বলে প্রচার করি। ফলে ভালো গান এবং সাধারণ গানের মধ্যে পার্থক্য করার সাংস্কৃতিক অভ্যাসটি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর-একটি বড় সমস্যা—পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। যে সংগীত দীর্ঘস্থায়ী, যে সৃষ্টির ভেতরে শিল্পমূল্য আছে, তা সবসময় প্রয়োজনীয় সমর্থন পাচ্ছে না। বরং দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠা, ক্ষণস্থায়ী বিষয়গুলিই অনেক বেশি প্রচার পাচ্ছে। শিল্পীর মতে, এটি শুধু সংগীতের নয়; সংস্কৃতিরও ক্ষতি।

নিজের ঐতিহ্যকে ভুলে যাওয়ার বিপদ

আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে ছিল বাংলা ভাষা ও বাংলা সংগীতের ভবিষ্যৎ। শ্রীকান্ত আচার্য মনে করেন, বাঙালির সবচেয়ে বড় সম্পদ তার ভাষা এবং তার গান। অথচ আমরা নিজেরাই সেই সম্পদের মর্যাদা দিতে ক্রমশ কুণ্ঠিত হয়ে পড়ছি। তিনি একটি তাৎপর্যপূর্ণ তুলনা টানেন। পশ্চিম বিশ্বের বহু মানুষ নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত শিখছেন, ভারতীয় রাগসংগীত নিয়ে গবেষণা করছেন। অথচ আমরা অনেক সময় নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছি না। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের উদাহরণও উঠে আসে। ভাষা এবং সংগীতচর্চার প্রতি সেখানকার মানুষের আন্তরিকতা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁর বিশ্বাস, একটি জাতি তার সাংস্কৃতিক সম্পদকে যত বেশি সম্মান করবে, সেই জাতির শিল্পও তত সমৃদ্ধ হবে।

রবীন্দ্রনাথ—যিনি প্রতিদিন নতুন করে ধরা দেন

জয়ন্তী চক্রবর্তীর কাছে রবীন্দ্রসংগীত কোনো অর্জিত বিদ্যা নয়; এটি চলমান সাধনা। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, রবীন্দ্রনাথকে তিনি আজও শিখছেন। প্রতিটি গান, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি উচ্চারণ নতুন করে ভাবতে শেখায়। তাঁর মতে, একজন শিল্পীর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব নিখুঁত স্বরলিপি পরিবেশন করা নয়; বরং গানের ভেতরের সত্যকে নিজের জীবনের সত্যে পরিণত করা। যে মুহূর্তে শিল্পী নিজে গানটিকে বিশ্বাস করবেন, সেই মুহূর্তেই শ্রোতাও তা বিশ্বাস করবেন। রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেও তাই তাঁর কাছে প্রযুক্তি বা অলঙ্কার নয়, অনুভবই শেষ কথা। তিনি নিজেকে কখনও ‘শিক্ষক’ বলতে স্বচ্ছন্দ নন। বরং ‘গান সহ’ নামের তাঁর সংগীতচর্চার পরিসরকে তিনি একটি যৌথ শিক্ষার জায়গা বলে মনে করেন। “অনেক সময় ছাত্ররাও আমাকে নতুন করে ভাবতে শেখায়”—এই স্বীকারোক্তি তাঁর শিল্পীসত্তার বিনয়কেই আরও উজ্জ্বল করে।

মঞ্চের বাইরেও যে পরিবার

বিদেশ সফরের আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসে জয়ন্তী চক্রবর্তীর কথায়। দীর্ঘ সফরে একসঙ্গে থাকা সংগীতশিল্পীরা তাঁর কাছে শুধু সহকর্মী নন, তাঁরা একটি বর্ধিত পরিবার। এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে, অনিয়মিত ঘুম, দীর্ঘ ভ্রমণ, ক্লান্তি—সবকিছুর মাঝেও এই সম্পর্কই শিল্পীদের মানসিক শক্তি জোগায়। কোনো সদস্য অন্য সফরে যোগ দিতে না পারলে তার অনুপস্থিতি কেবল সংগীতের জন্য নয়, বন্ধুত্বের জন্যও অনুভূত হয়। এই মানবিক সম্পর্কগুলিই মঞ্চের সাফল্যের নেপথ্যে নীরব শক্তি হিসেবে কাজ করে।

সুরের শেষ নেই

দীর্ঘ আলাপের শেষে বারবার মনে হয়েছে—শ্রীকান্ত আচার্য ও জয়ন্তী চক্রবর্তীর কাছে সংগীত কখনও কেবল পেশা নয়। এটি জীবনযাপন। তাঁদের কাছে গান মানে জনপ্রিয়তা নয় - সাধনা; সাফল্য নয় - সত্যতা; করতালি নয় - আত্মসমর্পণ। একজন বিশ্বাস করেন, শিল্পীকে নিজের কাজ করে যেতে হয়—স্বীকৃতি আসবে কি না, তা সময়ই ঠিক করে। অন্যজন মনে করিয়ে দেন, গানের সত্যিকার সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে তার বাণীকে বিশ্বাস করার মধ্যে। এই দুই দর্শন মিলেমিশে যেন বাংলা সংগীতের এক সুন্দর প্রতিচ্ছবি তৈরি করে—যেখানে ঐতিহ্য আছে, নতুন ভাবনা আছে, আত্মসমালোচনা আছে, আবার আগামী দিনের জন্য গভীর আশাও আছে। হয়তো সেই কারণেই তাঁদের গান শুধু শোনা হয় না, অনুভব করা হয়।

যতদিন বাংলা ভাষা বেঁচে থাকবে, যতদিন মানুষ গান শুনতে থামবে, চোখ বন্ধ করবে এবং শব্দের ভেতরে নিজের জীবনকে খুঁজে নেবে—ততদিন এই শিল্পীদের কণ্ঠ আমাদের সাংস্কৃতিক স্মৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকবে।



A reflection

by

Sriyan Sen

(Age 15 years)

I am learning Bengali because it is a part of who I am and where I come from. Just because I was born in the UK doesn't mean I should forget my roots or mother-tongue.

I want to stay connected to my roots and pass that connection on to the next generation. Thanks to my teacher Manjushree Jyamma and my parents & grandparents for it.

Sharing my attempt to express in Bengali what I felt during my performance.



**Me as "Bidhu" in
"Pujar- Saaj"**

গুজবৰ মাজে
আমাদেৰ বুজাৰে নাটক থেকে
আমি শিখেছি যে, কোনো জিনিষের
আমল মূল্য শুধু তার দামের
ভপর নির্ভর করে না। মা-বাবা
ও প্রিয়জনেরা নিজেদের মাতার মত
থেকে যা দিতে পারেন, মোটিই
আমাদের জীবনের অমূল্য
উপহার। অনেক সময় একটা
মাতারন বা ব্রহ্ম দামের জিনিষগু
আমার কাছে খুব মূল্যবান হয়ে
ওঠে, কারণ এর সঙ্গে ভালোবাসা,
স্মৃতি ও আবেগ জড়িয়ে থাকে।
এখন আমি বুঝতে পারি, কোনো
উপহারের আমল মূল্য তার দর,
তার দাম নয়, বরং তার সঙ্গে
জড়িয়ে থাকা অনুভূতি ও স্মৃতি।

POETRY PAGES

শব্দে আঁকা
মনের ছবি

কাশফুলের দোলায় ভাসে মায়ের সুগন্ধ!

চন্দ্রা বসু

আসছে পূজা, আসছে পূজা,
আসছে এবার পূজা!
শরত এসে গেলেই সবাই
দেখবে দশ ভুজা!

গ্রীষ্মে গরম কনে এবার বৃষ্টি
পাচ্ছি ভালো
আর কটা দিন গেলে ই
ননে জ্বলবে খুশির আলো!

দেশ বিদেশে আছে যারা
সবাই ব্যস্ত আজ,
পূজোর গন্ধে ঠিক করছে
নিত্য নতুন সাজ!

কিন্তু সবার আগে তো চাই
পূজোর সরঞ্জাম,
নিত্য কর্নের নাঝেও তাদের
বরছে অনেক ঘান!

বাচ্চা আর বড়োরা সব
নাচবে, গাইবে গান!
অভিনয় ও হতে পারে
এটাই অনুমান!

একটি বছর আগে আমি
ছিলেম বিদেশেতে
সপরিবারে নেতে ছিলেম
দুর্গা পূজাতে!

অনেক পেলেম বন্ধু আর অনেক বান্ধবী
সবাই মজায় কাটাও পূজো
আমিও নিজের দেশে!

সকলকে শারদীয়া দুর্গা পূজার আন্তরিক
শুভেচ্ছা জানাই॥



বার্নসলে পূজা

লোপা দাস

বহু বছর ধরে,
দেশ থেকে আছি দূরে।
মা, বাবা, ভাই, বোনকে ফেলে,
বিদেশেতে এলান চলে।
পূজো পার্বন হলে পরে,
মন খারাপ তো ভীষণ করে।
ইচ্ছে করে ছুটে যাই,
হায়রে কপাল, হয় কি তাই!

হঠাৎ করে খবর পাই,
বার্নসলেতে ছুটে যাই।
শেফিল্ডের সার্বজনীন দুর্গাপূজা,
কী আনন্দ কী মজা!
দাদা, দিদিরা আপন করে,
কাছে টেনে নেয় হাতটি ধরে।
কাছে ডেকে বলে আনায়,
ভোগ রান্নাতে হবে তোমায়।
ঘাবড়ে গিয়ে আঁতকে উঠি,
বিয়ের আগে ধরিনি বাঁচি।
এত রান্না কি করে করি,
দুর্গান্নাকে স্মরণ করি।
হঠাৎ দেখি গরাইদা এসে,
আনায় ডাকে নুচকি হেসে।

চিন্তা তোর হচ্ছে কিসে?
থাকবো আমি তোর পাশে।
অরুপদা বললো এসে,
করবো রান্না নিলেনিশে।
দাদাদের এই ভরসাতে,
খুশি তুলে নিলাম হাতে।
কত ডালে, কত ঢাল,
এবার তুই জলটা ঢাল।
হাতে ধরে শেখায় আনায়,
এই সব দাদা দিদিরাই।

তিরিশটি বছর পেরিয়ে আসি
আজ খাতা কলম নিয়ে বসি।
স্মৃতিগুলো সব ভেসে এলে,
ছড়ার রূপে দিলান তুলে।
দাদা দিদিদের অভিজ্ঞতা,
ভাই বোনদের কর্মক্ষমতা।
নিলেনিশে এক জোটে,
পূজো খুব জনে ওঠে।



পুজোর কাজ

লোপা দাস



পুজো পুজো রব উঠেছে,
পুজো কনিচি নিচিং করছে।
অনেক কাজ করতে হবে,
একজোট হয়ে লাগতে হবে।
এখন প্রথম কাজটা হলো,
ছুটির দরখাস্ত দিয়ে ফেলো।
কাজের লিস্ট বানিয়ে ফেলে,
দায়িত্ব ভাগ করে নিলে,
কাজটা হবে সুষ্ঠু ভাবে,
সবাই মিলে আনন্দ করবে।
পুরুত মশাই বলেছে আনায়,
এই কথাটা রেখো মাথায়।
পুজো শুরু আগের কাজ,
পুজোর শেষেও অনেক কাজ।
স্টেজে কাজ যে ই করবে,
এই দায়িত্ব ও সে ই নেবে।
ভোগ দেবে সকালে বিকালে,
রাঁধতে হবে কথা না বলে।
রাঁধা করতে দলবেঁধে,
এসো সবাই কোনর বেঁধে।
সজি কাটবো দাদাদের সাথে,
দিদিরা এসো বেলনা হাতে।

লুচি বেলতেও লাগবে লোক,
ব্যাঁকা ট্যারা যেননই হোক।
হাঁসি ঠাট্টা হবে মজা,
যখন তাদের হবে ভাজা।
খেতে কিন্তু একই হয়,
ব্যাঁকা ট্যারা আলাদা নয়।
ফুলকো লুচি পরবে পাতে,
আলুরদমও থাকবে সাথে।
জিভে জল আসছে ভেবে,
এই নেনুটাও রাখতে হবে।
দরজার পাশে বসে দুজন,
দেবে তারা খাওয়ার কুপন।
কত কাজ দ্যাখো ভাই,
একসাথে করবো তাই।
একে অপরের থাকবো পাশে,
করবো কাজ মিলেমিশে।
সার্বজনীন দুর্গাপূজা,
কী আনন্দ কী মজা!

আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দ বিরাজে

বন্দনা কুণ্ড

শরতের অস্তগামী রবি রাণ্ডায় মনের ছবি
ধরনের এই তলে আকাশে বাতাসে
নেঘের ভেলায় রঙের তুলি টানে।
প্রকৃতির প্রাক্কনে শরৎ এলেই
রঙের নেশায় বিশ্ব ভুবন মজে।

“বাজলো তোমার আলোর বেণু... মাতলো রে ভুবন”

মায়ের আগমনে শরৎ ভোরে শিশির ভেজা শিউলি
ঘাসের বুকে হাসে —
শারদ লক্ষ্মী অরুণ আলোর রথে
নবীন ধানের মঞ্জরী নিয়ে বাঙলার বুকে হাসে-
নেঘহীন নীলাকাশে দোয়েল, কোয়েল, শ্যামা
মায়ের আগমনে গান গায় নানা সুরে।
কুঞ্জ ছায়ায় ভ্রমর অলির গুঞ্জে
শারদ মাতার লুটিয়ে পরা অঞ্চলে
তরুণ তপন আলোকে কমল ফুটে
অঞ্জলি দেয়, শারদ মায়ের চরণে।

“জাগো দুর্গা জাগো দশপ্রহর ধারিণী
অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুনি জাগো।

মা আসছেন চতুর্দিকে আনন্দের রোশনাই
কাশের বনে নাচন লাগে ঢাকের তালে তালে,
বিহঙ্গেরা কোন সুদূরে আনন্দে তে চলে
নেই তো তাদের বাধা, বনের পশু মনের নেশায়
শরত আলোয় আনন্দেতে ঘোরে
নেই তো সীমা রেখা
ঋতু রাণী নতুন রূপে অপরূপা পরিপূর্ণা
বসেছে শুভ্র আসনে, অজি নিখিলের সম্ভাবনে
শ্বেত চন্দন তিলকে, বরণ করিল তোমাকে
অরুণ আলোর আলোকে॥



পরিবর্তন সুদীপ্তা সামন্ত

দিন তো অনেক গেলো
৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫ বছর !
তুমি আসবে বলে গেলে
আজও তোমার নেই খবর।
রঙ বদলের খেলা চলছে
রঙ নিলাস্তির নয়
অপেক্ষা সবারই সোনালি দিনের
তবু অন্তরেতে ভয় !
নতুনের কাছে নতজানু সব
পুরোনো দিয়েছে নাভিশ্বাস
আজও প্রতিনিয়ত প্রশ্ন জাগায়
কিংবদন্তি অবিশ্বাস
চিন্তা নয়, অপেক্ষা নয়
হাতে সময় বড্ড কন
তাকে আপন করতে হলে
ভুলে যাও পুরোনো জখম
সচেতন হও ,প্রতিবাদী হও
নাগরিক তুমি একাই
লক্ষের মাঝে লক্ষ্য শিহর
এসো করে দেখাই ।
ওঠো জাগো তৈরি হও
দোষারোপে কাজ কি ?
তোমার ইচ্ছাই তোমার প্রয়াস
বাকী সব মেকী ॥



ডেইলি প্যাসেঞ্জার

সুগত সরকার

গতকালের পরের দিনটা
জোর করে টেনে নেয় পাশে,
ঘুনচোখ নুছে বলে
দৌড়োগে যা এবার, রেসে।

রোজনামচার স্টেশন থেকে,
দুটি ট্রেন ছাড়ে।
একটি যায় অফিসপাড়া,
থেনে থেনে, ব্যস্ততার মাঝে।
আরেকটি ধৈর্যে যায় ছুটির দিগন্তে,
যেখানে জানলার পাশে বসে
রোদ পিঠে এসে নামে।



আগামীকালের আগের দিনটা,
করে না কোনো সবুর।
ঠেলে বসিয়ে দেয় সীটে,
পাশে কিছু নানকরা দিন,
উপাধি এক হলেও,
আলাদা নেজাজে।
কখনো গান্ধী জয়ন্তি
কখনো ভালেন্টাইন্স ডের সাজে।

জন্মদিন-
সে আবার, রেলো নিয়ে
দরজা ধরে ঝোলে।

এভাবেই চলে যায়,
সপ্তাহ- মাস- বছর।
একটা আরেকটার গায়ে পড়ে।
কেউ উঠে দাঁড়ালে,
অন্যজন বসে।
নুখ-চেনা দিনগুলো হাজিরা দেয়
সময়ের বাঁধানো লাল রেজিস্টারে।

হাফ-প্যান্ট ধারি শনি
জানালায় গাল ঠেকিয়ে
আত্মদে বেলা বয়ে যাওয়া দেখে
রবি, ছিল বড় শৌখিন।
থলে, প্রেসক্রিপশন, গিমি সামলাতে
ওভারব্রিজ ছেড়ে, সেও এখন
শটকাটে লাইন পারাপার করে।

কাল, পরশু, তরশু, নরশু,
সব ডেইলি প্যাসেঞ্জার!
তিনজনের সীটে,
চারজন চেপে বসে।

আর আনাকে?
ডাকনামেই ডাকে।
এই “আজ”-এর জন্যই জায়গা রাখে,
নসি় রাগা রুনা ল পেতে॥

দুঃখে সুখে মনোতোষ ভদ্র

একবার 'সুখ' এসে
আমার হাত ধরে বলেছিল
আমার সঙ্গে যাবে?
অনি যেখানে যাব সেখানেই যাবে?
অনি বললাম নিশ্চয়ই।
এমন সুযোগ কে আর হাতছাড়া করে।
চললাম দুজনে হাত ধরাধরি করে।

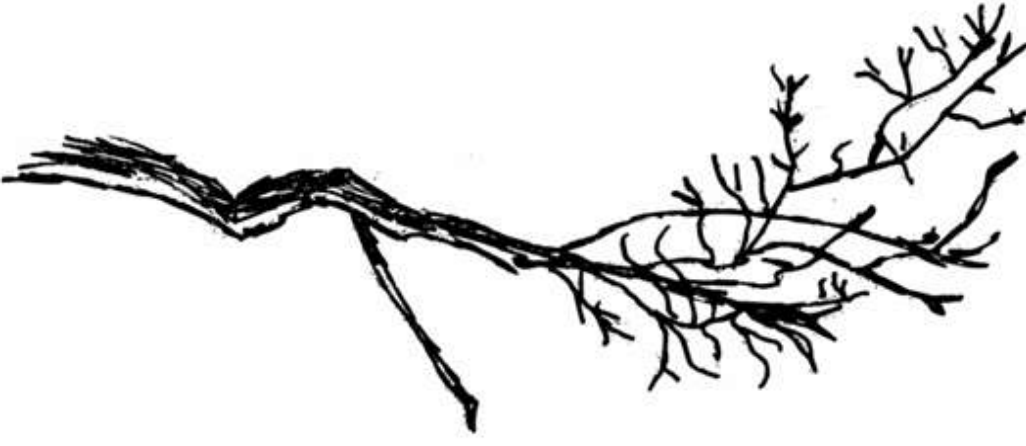
মুহুর্তে আকাশটা আরো ঘন নীল হয়ে গেল,
দূরে বনানী যেন হয়ে গেল আরো সবুজ,
শুকনো খটখটে পাহাড়ের চূড়ায় দেখা দিল,
দিক হারানো যাযাবর নেঘ-পাহাড়ের
চূড়োগুলো ঝুঁয়ে ঝুঁয়ে যাচ্ছে।
পাহাড়ের চূড়ায় শ্বেত শুভ্র ছোপ ছোপ বরফের আভাস।
আর আমার জীবন?
যেনমন্টি চাইছি, তেনমন্টি অনারাসে হয়ে যাচ্ছে,
আমার সংসারে সুখের জোয়ার,
স্ত্রী কন্যা পুত্র সবাই যেন আনন্দে নাতোয়ারা।
তারা যা চাইছে তাই পেয়ে যাচ্ছে,
আমার সংসারের আর পাড়াতুতো বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্য
যেন হয়ে উঠল নিবিড় আন্তরিক।
অভাব অভিযোগ শোক দূরে কোথায় নিলিয়ে গেল।

এমন যে হতে পারে কখনো ভাবিনি।
বিপদ হতে হতে দূরে চলে যাচ্ছে।
'সুখ' এবারে বলল
এস আমার ভাইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই
ওর নাম 'দুঃখ'।

'দুঃখ' বললো যাবে আমার সাথে?
অনি বেশ ভয় পেলাম মনে, তবুও বললাম যাব।
জানতাম একটা অনিশ্চিতের দেশে যাবছি।
শুরু হলো পথ চলা,

সেই রৌদ্রস্নাত নীল আকাশ
ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেল,
সূর্যের রশ্মি যা বল্লমের নতো মেঘ ফুঁড়ে
পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে,
সে কোথায় নিলিয়ে গেল।
দূরের বনানী সে আর সবুজ নয়,
মেঘের ছায়ায় সে আজ মলিন।
বাকবাকে পাহাড়ের চূড়ো গুলো
ঝুঁয়ে যাচ্ছে সেই কালো মেঘ,
পাহাড়ের সেই রূপ আর নেই।
সে খটখটে একটা বড় পাথরের চাঁই-নির্বিকার।
বারনাও যেন উম্মল নয়।
তারপর আকাশ বাতাস ছাড়িয়ে এল বিধ্বংসী ঝড়,
মানুষ পশু পাখি এবং কীট পতঙ্গ,
পৃথিবী এবং প্রকৃতি নিমেষে দিশেহারা।
অপ্রত্যাশিত ভাবে,
আমার সংসারে নেনে এলো
অসুখ বিসুখ, শোকের আবহ,
সেই হাসিখুশি মুখগুলো যেন
কোথায় হঠাৎ নিলিয়ে গেল।
চেনা মুখ গুলো আর চেনা রইল না।

অনি 'দুঃখকে' বললাম
অনি আর যেতে চাই না।
'দুঃখ' বললে ভয় কি, ও,
ওই দেখো না আমার ভাই
'সুখ' একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে ॥



ভাইফোঁটা

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা
বাম্বকদী জীবন দাবায় ছকে মন্ত্রী কাত
এখন রাজা! তোমার শেষ সময়
ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে
একটা বছর একটা দিন
তোমার আগু বাড়ে বাড়ে - বাড়েনা
ঝোঁকদের শুভেচ্ছা কপালে একে
যমের দুয়ারে এক পা বাড়াও
তোমার আগু কমে কমে কিসা কমে না ॥

হয়োনা ভেক

উভচর হওয়া চলে না
বড় জোর খেচর হতে পার
কিসা ছাড়া
দু পয়সার গ্যাস বেলুন কিনে
সুতো ধরে বুলতে থাক
নয়তো ধরালো ছুরি দিয়ে
নিজের কান দুটো কেটে ফেলো
বাই করো ভেক হতে চেও না

শুভেন সরকার

পূজোর চিঠি দীপালি দত্ত

মজা কোথায়, মজা কোথায়,
ওগো আমাদের রাঙা মাসি।
আমাদের তো হয়েছে হাঁচি,
তার সঙ্গে সর্দি কাশি।
বিজয়াতে দাদা-দিদিদের
দিও কিসি,
তোমাকে তো ভালোবাসি।
নেসোনশাইকে প্রণাম দিনু

ইতি,
তোমাদের সোনা চিনু

Chronicles of a Privileged Glutton

Asitama Sarkar

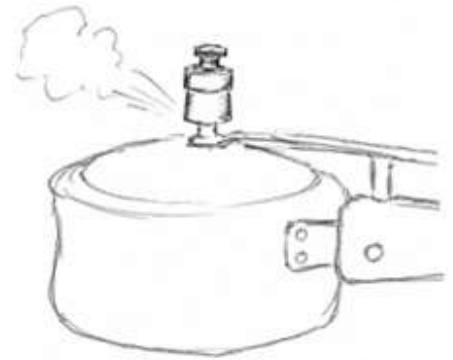
The shrieking whistle of the cooker was heard
Ma was trying a new recipe she recently discovered.
Lots of aromatic spices and chilli went into that pot
Seems like this mutton curry shall be blazing hot.

Just this morning phulko luchi were on the plate
Along with freshly cut mangoes, they definitely tasted great.
A piping hot cuppa started the day,
Alongside shaada aloo and boiled eggs on that breakfast tray.

Ain't no Englishmen, we don't do fancy tea
But evening cha and jhaal muri is a ritual, we do agree
Rainy days call for sizzling pakoras, baking days for fragrant cinnamon rolls
And sometimes just Marie biscuit shall satisfy our gluttonous souls.

Enough for the day, dinner shall be something light
However, having hakka noodles without chilli chicken does sound impolite.
There is no room left for dessert
But that baked roshogolla is such a flirt.

Retiring to bed after a short walk
Sipping chamomile tea and setting the alarm clock
Ma sits to check her recipe book
Curiously, she asks, "Tomorrow, what shall I cook?"



THE CITY OF JOY

Asitama Sarkar

“Cha cha, Gorom cha” , yelled the energised little boy
The sun has just begun to set in the city of joy.
Gathering in little groups of three or four
Enthusiastic lot gobbles their ‘begunis’ while taking a break from their chore.

Intense debates on differing political views
Gives the city its unparalleled perspicacious hues.
The youthful poets and singers assemble the instruments on the sidewalk at Park Street
Tagore and Manna Dey tunes resound as the passing crowd tap their feet.

Tram lines run across owning the landscape of the city
Whilst hand-pulled rickshaws tread the narrow paths with integrity.
Choosing to travel underground by metro, the traffic can be given a miss
Because let’s face it, blaring horns of those yellow taxis are never a bliss.
Clumsy fingers dip into clay pots of spongy roshogollas
And the street shoppers wander through the stalls at Gariahat’s mohollas.
The bookworms eagerly ponder over their muse at College Street
And young lovers romance under Victorian edifice in the sultry heat.

One cannot dismiss the richness of the warmth and culture, surely
The spirits here are always buoyant and lively.
The hustle- bustle of the city is not extraordinary
Yet, it has an unique charm , rather arbitrary.





What If the World Was Upside Down?

Somrik Ghoshal

What if the world was upside down?
The king would be left with no crown.

What if planes were beneath the sea?
All the veggies would fall out, including peas.

What if submarines were above the clouds?
All the people would say, "Wow!" out loud.

What if we were poor, with no money in our pockets?
We would probably be confused about plug sockets.

What if cars fell on our heads?
Hehe, that's not going to happen, because we'll be flying ahead!

What if gravity pulled us up?
Newton and Einstein would be shocked.



The Sisters and the Magical tree

Once upon a time there was a girl called Romi. Romi had a really big dream. Her dream was to have a little sister. One day Romi and her parents move to the countryside where she found enchanted woods. Romi decided to go and explore the enchanted woods.

In the enchanted woods there was a ginormous tree. The tree started to talk to Romi. She started to get a bit scared. The tree said 'don't be scared Romi!' She said how do you know my name and how can you talk? The tree said ' I am a magic tree and I can grant you one wish'. Romi said I wish to have a baby sister. The tree said I will grant your wish. A few months later Romi's wish came true.



When the wish came true Romi started to play with her baby sister. One day Romi decided to show her baby sister Meredith the magic tree. Meredith was amazed by the tree. The tree said to Meredith you can make one wish and I will make it come true.



Meredith did not know what to wish for. So then she thought long and hard and wished for a pink glamorous shiny beautiful friendly pony. After a few weeks, months and then years, she moved into another house. After a few days in that house she went to the farm and the farmer said to her 'do you want a pink glamorous shiny beautiful friendly pony?'

Meredith said yes and she was very happy that her wish came true in the end.

Amara Ruby Biswas-Abrol
8 years old.

রেল যাত্রার তিন পর্ব,

নব কুমার বসু

তারা সবাই হাওড়া দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের যাত্রী। বিকেল পাঁচটা, হাওড়া সাত নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে রাজধানী ছাড়বে। ট্রেন দেওয়া হয়েছে একটু আগে থেকেই। যাত্রী সাধারণের সুবিধে হবে। এই ট্রেনে অতিরিক্ত যাত্রী নেওয়ার উপায় বা ব্যবস্থা নেই। সমস্ত বগি সংরক্ষিত। যাত্রীরা অগ্রিম রিজার্ভেশন করেন। কেউ থ্রি টায়ার বা টু টায়ারে, অল্প কিছু ফাস্ট ক্লাস ক্যুপে।

হাওড়া থেকে বিকেল পাঁচটায় ছেড়ে পরের দিন সকাল দশটায় রাজধানী এক্সপ্রেস নয়াদিল্লি পৌঁছবে। পুরো ট্রেনের সব বগি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ এসি। ইদানিং মধ্যবিত্ত বাঙালির বড় পছন্দের গাড়ি, বিশেষ করে দিল্লি অথবা ধারে কাছে বেড়াতে যাওয়ার জন্য। রিজার্ভেশন করা থাকে, তবু বাঙালি তো! টেনশন থাকেই। না থাকলেও করে। মৌসুমী, উজ্জ্বল আর পনেরো বছরের মেয়ে মাম্পি এসি থ্রি-টায়ারের যাত্রী।

শ্রীপর্ণা, দেবাশিস আর চোন্দো বছরের বাবাইও ওই একই কম্পার্টমেন্টের উল্টোদিকে তিনটি সীট ও বার্থ পেয়েছে। পুজোর ছুটি চলছে। বাঙালি এ সময় বেড়াতে যায়। দিল্লি হয়ে নানান দর্শনীয় স্থানে যাওয়া যায়। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এসে থামা মাত্রই লটবহর নিয়ে যাত্রীরা ছুটেছে তাদের নির্দিষ্ট বগিতে ওঠার জন্য। বাক্স প্যাটরা, সুটকেস- পুলঅন, রাকস্যাক, টিফিন ক্যারিয়ার (ট্রেনে খাওয়ার দেওয়া হবে তা সত্ত্বেও) ব্যাগ -বোঁচকা, পুঁটলি, টেডিবেয়ার, ফোল্ডিং বাইক, জলের ফ্লাস্ক, (দরকার নেই তবু,)। যাত্রীদের সঙ্গে কুলিরাও। ছোটো পাটির দরকার নেই, তবু, দখল নিতে হবে তো! উজ্জ্বল দেবাশিসদের তিন - তিন সীট ও বার্থ, মুখোমুখি। গলদ ঘর্ম হয়ে সবাই ঢুকে পড়েছে, এদিকে এসি তখনও চালানো হয়নি। শুধু গরম না, আবছা অন্ধকারও কম্পার্টমেন্টের ভেতরে। কেউ কেউ মোবাইলের আলো দিয়ে নিজেদের সীট নম্বর খুঁজে পেয়ে উচ্ছ্বসিত। বৌ, বাচ্চাদের ডেকে নিচ্ছে, বকুনি দিচ্ছে। জিনিসপত্র টানা হ্যাঁচড়া চলছে। উজ্জ্বলরা উঠেছে লাগেজ নিয়ে। দেবাশিসরাও পিছিয়ে নেই। পুলঅন, রাকস্যাক, হাতব্যাগ...। সহসহযাত্রী নাকি প্রতিপক্ষ! ঠেলাঠেলি টানাটানির উন্মত্ত প্রতিযোগিতা। গুরু হয়ে গেল প্রথম পর্ব: আবছা অন্ধকারে, ঘুপচি জায়গার মধ্যেই ছটি প্রাণী...মাল রাখছে-টানছে -সরাচ্ছে- ঘামছে ...।

দাদা আপনার ব্যাগটা সরান তো ওখান থেকে। ওটা আমাদের সীট।

এক মিনিট দাঁড়ান...জানি ওটা আপনাদের জায়গা। উল্টোদিকে আমাদেরও। দাঁড়ান একটু...।

দাঁড়ালে তো হবে না। আমাকেও যে মাল রাখতে হবে।

রাখবেন বৈকি...আমি তো বারন করি নি...।

কিন্তু আপনি জায়গাটা দখল করে রাখলে আমি কি করে রাখব।

এক মিনিট তর সইছে না আপনার? দেখছেন না সুটকেসটা সরানোর চেষ্টা করছি। আশ্চর্য তো!

এদিকে আমি যে এত বড় মালটা হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছি...তার বেলা?

হাতে ধরে রেখেছেন কেন? অন্য কোথাও রাখুন...।

অন্য কোথাও কোথায়? আপনার মাথায়?

কী মুশকিল রে বাবা...আপনি তো অদ্ভুত লোক মশাই! সহ যাত্রীর সঙ্গে এইভাবে কথা বলে কেউ?

অদ্ভুত আমি না আপনি? দেখতে পাচ্ছেন না হাত ভেঙে যাচ্ছে...! তার মধ্যে আপনি জ্ঞান ঝাড়ছেন!

নারী কণ্ঠ: আহা, ঠিক আছে...তুমি পুল-অনটা ওপরের বার্থে তুলে দাও না এখন!

ওখানে জায়গা কোথায়? বাবাই তো আগেই উঠে বসেছে ওর রাকস্যাক আর কী কী সব নিয়ে।

নারী কণ্ঠ- মাম্পিকে - দেখি, খুকু তুমি একটু সরে বসো তো ওদিকে...।

মাম্পি: খুকু! আমাকে আপনার খুকু মনে হল? জানেন, আমি বেলতলা গার্লের ক্লাস নাইনে পড়ি?

নারী কণ্ঠ: আচ্ছা বাবা ভুল হয়েছে। এখন একটু সরে বসতে তো পারো...!

অন্য নারী কণ্ঠ: সরে তো আপনিও বসতে পারেন...অতখানি জায়গা ফাঁকা পড়ে রয়েছে আপনার পাশে।

নারী কণ্ঠ: ফাঁকা কোথায় দেখছেন? আমাদের এতগুলো লাগেজ কি হাওয়ায় ভাসবে! কী যে বলে!

এত মাল নিয়ে জার্নি করেন কেন? বলিহারি যাই।

এই মেয়ে, তুমি সরো তো দেখি আগে...

পুরুষ কণ্ঠ: খবরদার মাম্পি তুই এক চুল সরবি না ওখান থেকে। ওটাই তোর সীট।

অন্য পুরুষ: সীট কি কেউ কেড়ে নিচ্ছে স্যার আপনাদের? এই যে রাখুন এবার আপনার মাল।

নারী কণ্ঠ: তুমি এবার একটু স্থির হয়ে বসো তো! ঘামছো! বলি... সিগারেট টা ছাড়ো।

স্থির হয়ে বসব? আর সীটের নিচে সব জায়গাটা দখল হয়ে যাক? তখন কোথায় সুটকেস ঢোকাবো?

পুরুষ কণ্ঠ স্ত্রীকে: পই পই করে তোমায় বলেছিলাম, ওই এক্সট্রা ব্যাগ আর টিফিন-বক্স এনো না...এবার বোঝো!

আমার জন্য এনেছি নাকি? তুমি তো বললে, ফিশ ফ্রাই কটা সঙ্গে নিলে...একটু বসার সময়...।

বাবাই ওপর থেকে: ওটা আমার কাছে পাস করে দাও না মা... আই এম হাংরি ।

একটু দাঁড়াও বাবা...অন্তত আলো আর এসিটা আসতে দে... উঠতে না উঠতেই ছেলের খাই খাই...।

পুরুষ কণ্ঠ: সত্যি কী যে স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে, রাজধানী এক্সপ্রেসের? যে পারছে, সেই চলেছে!

অন্য পুরুষ: ওরকম কমেন্ট করবেন না স্যার। কো প্যাসেঞ্জাররা মাইন্ড করতে পারে, বুঝলেন?

হ্যাঁ বুঝলাম। কিন্তু আপনি গায়ে মাখছেন কেন? আপনাকে তো আমি...।

নারীকণ্ঠ: আহ- হা তুমি চুপ করো না একটু। বরং বাইরে গিয়ে একটু দেখো কখন এসিটা চালু করবে...। বাব্বা....!

তুমি কি ভাবছো, আমি বাইরে গিয়ে দেখলেই ওরা কানেকশন দেবে?

মাম্পি হঠাৎ বলে উঠল, দেখি আমি একবার বাইরে যাচ্ছি...টিটি-কে যদি দেখতে পাই...।

নারীকণ্ঠ: বোস দিকিনি চুপ করে ...বড় একেবারে নেত্রী হয়েছে...। একটুও নড়বি না এখান থেকে। হঠাৎই চিরিক করে ওঠে একটা শব্দ, লাইট জ্বলে উঠেছে বগির মধ্যে। হ্যাঁ, পাখা আছে, সেইগুলো মুহূর্তের মধ্যে দ্রুত ঘুরতে শুরু করেছে। বিনবিন শব্দ হচ্ছে, অর্থাৎ এসিও চালু হয়েছে।

একটা ‘আহ বাবা বাঁচলাম’...। সম্মিলিত শব্দের সঙ্গেই যেন হঠাৎ নীরবতাও নেমে এসেছে থ্রি টায়ার কম্পার্টমেন্টের মধ্যে। সবাই দেখতে পাচ্ছে বাকি সবাইকে এতক্ষণে। বোধহয় একটু সংকুচিত ভাব। তা সে যাকগে। সকলেরই যাহোক গোছগাছ প্রায় হয়ে গেছে। অতিরিক্ত কেউ কেউ, গাড়ির ড্রাইভার কাজের ছেলে সবাই ...নেমে গেছে। দন্ধ অবস্থা কেটে গিয়ে সকলেই মোটামুটি শান্ত হয়ে বসেছে। উহ বাবা...একটা ধকল গেল বটে...। হ্যাঁ, এবার সেই প্রার্থিত ক্ষন উপস্থিত। ইঞ্জিনের বাঁশি বেজেছে। গাড়ি নড়েছে। প্ল্যাটফর্মের দোকান সরে যাচ্ছে, বাঙালি যাত্রী যে কাকে উদ্দেশ্য করে কপালে হাত ছোঁয়ায় কে জানে! ট্রেন গতি নিচ্ছে, খুব আস্তে লাইন বদল করতে করতে।

দ্বিতীয় পর্ব:

দ্রুতগতিতে ট্রেন ছুটছে... তবলার লহরার মতো, ‘ধেরে কেটে তেরে কেটে’ তাক ধিন..., তে -তে, কেটে ধেন তাক। রাজধানী এক্সপ্রেস বলে কথা। সময়মতো পৌঁছোতে হবে দিল্লি। মাঝখানে মাত্র চারটে স্টপ। হাওড়ার পরে প্রথমেই ধানবাদ, তারপর মোগলসরাই, এলাহাবাদ, কানপুর। তারপরে দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যেই ...। ধানবাদ পৌঁছোতেই অবশ্য চার ঘণ্টা। তার মধ্যে স্ল্যাক্স অ্যান্ড ডিনার এসে যাবে। কোচ অ্যাটেনড্যান্টরা ইতিমধ্যেই দ্রুত হাতে প্যাসেঞ্জারদের সিঙ্গারা, সন্দেশ আর লাল রঙের গ্লাসের মতো চায়ের ফ্লাস্ক ধরিয়ে দিয়ে গেছে। চাদর বালিশ, কুটকুটে কম্বল ওপরের বার্থে। নিবিড় ঠান্ডা বগির মধ্যে। আরামদায়ক পরিবেশে থিতু যাত্রী সাধারণ। গল্পগুজব নিজেদের মধ্যে। জানলায় ডবল ঘষা কাঁচ। সুতরাং বাইরের প্রায় কিছুই দেখা যায় না। এইটুকু বোঝা যায়, এখনো পুরো অন্ধকার হয়নি। কিন্তু সদ্য পুজোর পরে, এখন বেলা ছোট হয়ে গেছে। আঁধার নেমে আসবে একটু পরেই। তা বলে এখনই তো আর শুয়ে পড়া যায় না। ট্রেনের দ্রুতগতিতে দুলুনিতে এবার মনটাও বেশ ঝরঝরে। কতক্ষণই বা শুধু পরিবারের সঙ্গে কথা বলা যায়! উশখুশ।

আবার কিছুক্ষণ আগেই বচসার মতো যেসব কথাবার্তা...! আরোষ্ঠতা তো থাকবেই। তাহলেও এত কাছাকাছি বসে কাঁহাতক আর মোবাইল খুলে বসে থাকা যায়। তাছাড়া কিঞ্চিৎ গোপন তরলের আয়োজন ...। উল্টোদিকের সহযাত্রীর সঙ্গে সহজ না হতে পারলে, তাও তো ঢুকু ঢুকু হবে না। হঠাৎই যেন আপনিই শুরু হয়ে যায় : আপনারাও দিল্লিতেই? একটু আগেকার শত্রুভাব কাটাতেই হয় আর একজনকেও। একসঙ্গেই তো যাওয়া। হ্যাঁ...এই আর কি...পুজোর ছুটি!

সেই তো, তাছাড়া আর কী! লম্বা ছুটি আপনাদের?

ওই মোটামুটি যাতায়াত মিলিয়ে দু সপ্তাহ...। আপনাদের?

আমাদেরও ওই রকমই। কালীপুজোর দিন সকালে ফিরব।

আমাদের অবশ্য আর দুটো দিন বেশি। ম্যাডামের দাদা দিল্লিতে, ভাইফোঁটাটা দিয়েই আসতে চায়।

তা বেশ, রথ দেখা, কলা বেচা ...দুই হবে।

হা-হা-হা, যা বলেছেন। আপনারা কলকাতা থেকেই?

হ্যাঁ, গড়িয়া, আপনারা?

বেশি দূর না...ওই...কুঁদঘাট...।

রমণী কণ্ঠ: আসলে আমাদের ওখানটা টালিগঞ্জই পড়ে। (গোপনে স্বামীকে ঠেলা মেরে)

অন্য রমণী: আসলে এখন মেট্রো হয়ে যাওয়াতে ওদিকের সব জায়গাগুলোই যা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে....!

হঠাৎ মাম্পি: হ্যাঁ, আমি তো প্রায়ই মেট্রোতে যাতায়াত করি।

বাবাই: আমাদের বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলের বাস সার্ভিস খুব ভালো।

শুধু বাস সার্ভিস কেন? বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট কলকাতার বিখ্যাত স্কুল...। আগের মতো নেই অবশ্য...তাহলেও ...।

কী করে থাকবে বলুন! পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে এই সরকার কোথায় নামিয়েছে...।

ও, সে কথা আর বলবেন না। আপনি কি শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গেই?

না মশাই, শতহস্ত দূরে, আমার একটি ছোটোখাটো ব্যবসা আছে...ওষুধের ডিলারশিপ। আপনার?

সরকারি চাকরি। তবে স্টেটের না, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের। ...আপনার কি পা রাখতে অসুবিধে হচ্ছে? এই তো তুলে দিন না, এইখানটা...। আমি ব্যাগটা সরিয়ে দিচ্ছি...এতটা পথ যাওয়া সংকোচ করবেন না...।

থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, অসুবিধা ঠিক না, তবে পা তুলে বসতে পারলে তো...।

হ্যাঁ হ্যাঁ বসুন। নিজেদের মধ্যেই তো ! তাও ভালো, দেখুন, দুটো উটকো উড়ে -মেরো আমাদের দিকটায় এসে পড়েনি।

হা-হা...যা বলেছেন। আমি তো সেই জন্যই প্রথম থেকেই একেবারে জামা প্যান্টও বদলে লুঙ্গি পরে নিলাম।

বেশ করেছেন, লম্বা জার্নি, একটু রিল্যাক্স করে যেতে না পারলে কি চলে!

একদম আমার মনের কথাটি বলেছেন। (সামান্য ইতস্তত করে) রিল্যাক্স করার একটু ব্যবস্থাও অবশ্য আমার সঙ্গে...মানে...

আ -আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি...। সে তো অতি উত্তম কথা। সংকোচ করবেন না, শুরু করে দিন। জার্নিতে সব চলে।

যাক, হা-হা-হা...নিশ্চিন্ত হলাম। তবে এক যাত্রায় পৃথক ফল তো হতে পারে না স্যার...!

নারী কণ্ঠের সংলাপ ওদিকে চলছিল যথারীতি এদিকের মতই। হঠাৎ এদিকের কথা কানে গেছে। মুখ ঘুরিয়ে মন্তব্য : কিন্তু মাত্রা যেন ঠিক থাকে আর একটু আড়াল করেই রেখো।

সে তোমায় ভাবতে হবে না, ফ্লাস্কটা দাও। আর প্লাস্টিকের গ্লাস ফিশ ফ্রাইটাও বার করো।

নারী কণ্ঠঃ এই তো, বার করাই আছে (হেসে)। আমাদের কথাটাও মনে রেখো, দু চুমুকে ফ্রেশ লাগবে।

আরে সে আর বলতে! আসুন স্যার...!

হ্যাঁ দিন, থ্যাংক ইউ, এই ব্যাগটার আড়ালেই রাখছি। আসলে রাজধানীতে সবাই খায়, শুধু একটু নলচে আড়াল...!

তাছাড়া আর কী! এইটুকু তো আমাদের মতো মধ্যবিত্তদের...। তবে সাবধানে রাখবেন, চলকে না পড়ে ঝাঁকুনিতে।

হা-হা-হা, তা নিয়ে ভাববেন না। সরকারি কাজে অনেক সময় তো গাড়িতে ফিরতে হয় দূর থেকে...।

গাড়ির দুলুনি, নীলাভ আলো, ফিশ ফ্রাই সহযোগে সোনালি, তরল পানীয়, সব মিলিয়ে পরিবেশটা বরই রমণীয়। অন্যান্য যাত্রীরাও যার যার নিজেদের মতো বাঙালি আনায় অকুপাইড হয়ে জমিয়ে ফেলেছেন। বাবাই আর মাম্পিও আর আলাদা না বসে একদিকের আপার বার্থে চলে এসেছে। বেশ বকর বকর করছে। দুই মহিলা তো বটেই। সঙ্গে একটু চুমুক।

ধানবাদে গাড়ি পৌঁছানোর মধ্যে নিশ্চিহ্ন নিরাবতা নেমেছে সব কম্পার্টমেন্টেই।

নৈশভোজ এবং আনুষঙ্গিক আয়োজন-প্রয়োজন সেরে, বাঙালি যাত্রীগণ শুয়ে পড়েছেন যার যার বার্থ দখল করে।

তৃতীয় পর্ব:

কখন যে ট্রেনের চাকায় দূরত্ব আর পথ গুটিয়ে গেছে, বাঙালি টেরও পায়নি। রাজধানী কানপুর ছেড়ে গেছে। চা আর প্রাতরাশের আয়োজনটি মোটামুটি মন্দ নয়। প্রাতঃকৃত্যের সমস্যাও যা হোক ম্যানেজ হয়ে গেছে।

গুড মর্নিং। ভালো ঘুম হয়েছিল তো? দেখে তো ফ্রেশই লাগছে।

হ্যাঁ, ফার্স্ট ক্লাস। এইটুকুই তো রাজধানীতে আসার মজা। আপনার সব ঠিক ছিল?

নট ব্যাড, দুবার উঠতে হয়েছিল টয়লেটের জন্য, তাছাড়া ফাইন।

আপনাদের ট্যুর কোনদিকে? শুধু দিল্লি, আগ্রা নাকি ...।

ফতেপুর সিক্রিও আছে। তারপর রাজস্থান...বেশি তো হবে না। শুধু জয়পুর, উদয়পুর। আপনাদের?

আমরা এবার পাহাড়ের দিকটা কভার করছি। কুলু, মানালি, সিমলা...।

বা-বা- বা, খুব ভালো। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল আমার এক কাজিনের টুইন মেয়ের নাম কুলু-মানালি...হা-হা -হা।

নারী কণ্ঠ: এখন দুজনেই এগারো বছরের। খুব মিষ্টি দেখতে হয়েছে।

বার্থের ওপর থেকে মাম্পি: মা, ওদের ভালো নাম মেঘনা আর যমুনা, আন্টিকে বলো।

নারী কণ্ঠ: আচ্ছা, তুমি এবার নিচে নামো। আফেল আন্টির সঙ্গে আলাপ করবে এসো। -ওহো- হো, বাই দ্য ওয়ে, আপনাদের মোবাইল নম্বর তো নেওয়া হলো না এখনো...।

অন্য নারী কণ্ঠ: হ্যাঁ গো, আর কতক্ষণ আছে দিল্লি পৌঁছোতে?

অ্যাটেনডেন্ট তো বলল বাইশ মিনিট লেট। হয়তো খানিকটা মেকআপ করে নিতে পারে।

যা হোক, চলুক, আমাদের আর কী যায় আসে ওইটুকুতে! আপনাদের কেউ পিকআপ করতে আসবে..? হ্যাঁ...সিআর পার্কের

হোটেল থেকেই গাড়ি আসবে...। আচ্ছা...মোবাইল নম্বরটা নিন...নাইন-এইট-থ্রি...। সত্যি আপনাদের খুব মিস করব।

আমরাও। অবশ্য মোবাইল নম্বর তো রইল...। বলা যায় না, সামনের বার একসঙ্গে সবাই মিলে...।

ভুলে যাবেন না কিন্তু...কিপ ইন টাচ।

আবার একটু একটু করে ছোটোখাটো গোছগাছ সেরে নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। গতকাল বিকেলে কলকাতা, তারপর হাওড়া থেকে যে যাত্রা শুরু আজ আর কিছুক্ষণ পরে দিল্লি পৌঁছে তার সমাপ্তি হবে। তারপর যে যার পরিকল্পনা, আয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন দিকে চলে যাবেন। মধ্যবিত্ত বাঙালির বাৎসরিক ভ্রমণের ঘটনা এমনই হয়।

সূচনাটা কি আর একটু অন্যরকম হতে পারত? আর একটু ধীরে সুস্থে ওঠা, জিনিসপত্র রাখা। সহযাত্রীর সঙ্গে সহযোগিতা... কেউ কারোর জায়গা তো দখল করে নিতে পারবে না। সবই গোনাগুনতি, পূর্ণ স্থিরকৃত। এক যাত্রায় পৃথক ফলোও হবে না। তা সত্ত্বেও দীর্ঘ -রেল ভ্রমণের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা, তিক্ততা, বাদানুবাদ, প্রতিযোগিতা, শত্রুতা। আর তারপর?

হাসছেন? হাসুন ক্ষতি নেই।

সঙ্গে একটু ভাবাও যেতে পারে। নাহ তাতেও লাভ নেই। আমরা অমনই ছিলাম, আছি। দিব্যি চলছে। বিরল ব্যতিক্রম ব্যাতিত বাঙালিরা বাঙালিই যে! অধৈর্য, অস্থির, তর্কিক। আবার আবেগপ্রবণ, আন্তরিক, উদার। হা -হা -হা ॥

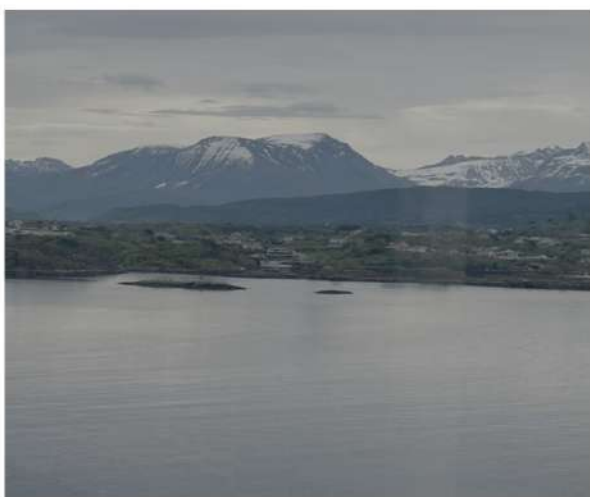
Visiting a Norwegian Glacier: Where Ice, Silence, and Human Wonder Meet – but there is much more!

Kaustabh Raychaudhuri

Norway's glaciers—whether it's Jostedalsgreen, Nigardsbreen or Briksdal - are not just masses of ancient ice, they are living landscapes that breathe, shift, crack, melt, and reshape the world around them. Visiting one isn't just sightseeing; it's entering a relationship with deep time.

The first encounter is a wall of blue ice. The approach is always the same: a long valley carved by thousands of years of glacial movement, waterfalls tumbling down steep cliffs, and a cold wind that arrives before the glacier itself comes into view. Then, suddenly, it appears—an immense wall of blue-white ice, fractured like glass and glowing from within.

The colour is the first surprise. Glacial ice isn't white; it's blue, compressed over centuries until air is squeezed out and only pure, dense ice remains. It feels ancient because it is—some layers date back more than 10,000 years.



Yes, we did visit the glacier and its surroundings for beauty and pleasure **but there is much more to me** - glacier can bring several important things to our daily life, especially in the way we think and live: It makes us aware of nature and reminds us of the fragile nature of the earth and understanding climate change: Glaciers show visible signs of global warming as they melt and retreat.

We can transfer the same glacier lesson to a **community** by thinking about how people live, support, and grow together. A community is built layer by layer, like a glacier is formed over time. Every person adds strength, just as every layer of ice becomes part of the whole glacier. A community moves forward slowly but powerfully when people work with patience and unity. It needs care and balance, because without respect, trust, and support, a community can weaken.

“We can transfer the lesson of a glacier into community life by understanding that strong communities are built slowly, layer by layer, through patience, calmness, being thoughtful and shared responsibility, care for one another, and respect for the people & world around us.”

Long live SDDCC !

ডিভোর্স

ঈশিতা প্রামাণিক

পিয়ালী বরের আসনটিকে নিজে হাতে সাজাচ্ছিল ফুল দিয়ে। হঠাৎই পিয়ালীর কানের কাছে বেজে উঠলো সেই কথাটা “ডিভোর্সী মায়ের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করিনা।” এক ছুটে ওপরে গিয়ে মেয়ের ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে উঁকি দিয়ে ঢোকে পিয়ালী। ঘর ভর্তি পাখগুলীর বন্ধুরা এবং পাখগুলীর দিদি রোজ্যায়ান ও রয়েছে। সাজাচ্ছে সকলে মিলে মেয়েকে, বড্ড সুন্দর লাগছে পাখগুলীকে, নিজের মেয়ে বলে নয়। কাছে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলো মেয়েকে। পাখগুলী স্বাভাবিক ভাবেই “mum, what happened now?” বলে ওঠে। “Nothing মা” বলে পিয়ালী। বন্ধুরা ‘ও-ও-ও’ করে ওঠে। মেয়ের কপালে চুমু দিয়ে বেরিয়ে আসে পিয়ালী।



ছোটবেলা থেকেই ডিভোর্সী কথাটা শুনলেই পিয়ালীর মনে হতো একটি দুঃখিনী নারী। কেন, কখনও দুঃখী পুরুষকে মনে হতো না? একজন ডিভোর্সী মহিলা (সন্তান নিয়ে হলে তো কথাই নেই) যুদ্ধ করছে বেঁচে থাকার জন্য। তার দিকে আঙুল দেখিয়ে সমাজ বলছে, ‘স্বামী ছেড়ে দিয়েছে’। বুকে তার যে কি ক্ষত এবং সে ক্ষত কার দোষে, তা জানার জন্য কারও মাথাব্যথা নেই। সেই ডিভোর্সী পুরুষটি ইতিমধ্যেই হয়তো বিয়ে করে (বোধহয় যার প্রেমে পড়ার জন্য এই ডিভোর্স, তাকেই) নির্বিঘ্নে সংসার সাজিয়ে বসেছেন।

জ্যাঠা, বাবা, কাকা, মামনি, মা, কাকিমা, দিদিভাই, ভাই ও ছোট ভাই – এদের সকল কে নিয়ে, এই সংসারে বড় হয়েছে পিয়ালী। পিসিরাও ছিলেন, আসতেন মাঝে মাঝে, তার মধ্যে মেজোপিসিই উল্লেখ্য। মা, কাকিমাকে মেজোপিসি সর্বদা বোঝাতে চেষ্টা করতেন, তিনি এদের থেকে একটু উঁচুস্তরের। তিনি চাকুরী করেন, মা কাকিমা তার থেকেও শিক্ষিতা, কিন্তু চাকুরী করেন না। মেয়েদের প্রশংসায় কানে জ্বালা ধরিয়ে চলে যেতেন যখনই আসতেন। তার মেয়েদের সঙ্গে দিদিভাইয়ের তুলনায় বড়ই আনন্দ পেতেন মেজোপিসি। দিদিভাই সর্বদা নিজেকে সরিয়ে রাখতো মেজোপিসির এই তুলনামূলক কথাবার্তার জন্য। মেজোপিসির মেয়েদের তুলনায় দিদিভাই-এর অনেক কম বয়সে বিয়ে হলো। মেজোপিসি বিয়ের দিন দিদিভাইকে অকারণে কাঁদিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। সবাই অসম্ভব হলো কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে পারলো না, যা ছোট পিয়ালী মেনে নিতে পারেনি কোনদিন। পিয়ালী এখনও সেই দিদিভাইয়ের কান্নাটা দেখে চোখ বুজলেই।

বেশ ছোট বয়সেই পিয়ালীর বিয়ে হয়ে যায়। পাঁচটিকে মায়ের খুব ভালো লাগে। ওই সময়ই পিয়ালী বুঝেছিল – পিয়ালীকে ঝড় সামলাতে হবে। তবুও মায়ের খুশিটাকেই আশীর্বাদ ভেবে বিয়েতে রাজী হয়েছিল। বিয়ের পরই পিয়ালী বোঝে কোথায় গন্ডগোল। মায়ের অনুমতি ছাড়া পথিক কোন কিছুই করে না; শুতে আসার আগেও অনুমতি নেওয়ার অভ্যাস। কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে গল্পের সময় পিয়ালী চুপ করে থাকে। কত স্বাধীন তাদের জীবন যাত্রা। পড়াটাকে প্রধান করে নিয়ে কাটিয়ে যায় দিনের পর দিন। না আর নয়, এত মায়ের ভয়ে সিটিয়ে থাকা মানুষ নিয়ে সারা জীবন চলতে পাড়া যায় না। প্রতিবাদের ফল অশান্তি। প্রধান ভূমিকা নেন পথিকের মা। ভাইদের মনের কথা বলে পিয়ালী। দুই বছরের মধ্যে ভেঙে যায় সকল কিছুই।

দিদিভাই - যে ছেলের ছুটিতে পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত বেড়াতে যায় প্রতিবছর, বাইরের জগৎ দেখে এত, সেও বলল, ‘গালে চড় খেয়েও সংসার করতে হয়, ঘর ছাড়লো কেন এইভাবে। পিয়ালী এখন বোঝে মেজোপিসি এত সহজে ওকে কেন কাঁদাতে পেরেছিলেন। অনেক পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তি মেনে নেওয়ার পর অবশেষে ডিভোর্স পায় পিয়ালী। দুই ভাই সর্বদা পাশে ছিল। উকিলের তত্ত্বাবধানে সঠিক ভাবে এলিমোনি নিয়ে পিয়ালীর ডিভোর্স হয়।

পিয়ালী বাবা মায়ের কাছেই থাকে। পড়াশোনা করে চলে, পড়ার পাশে কম্পিউটারটার সঙ্গে যুক্ত থাকে। একদিন ক্লাস করে এসে সন্ধ্যাবেলায় খেতে বসেছে পিয়ালী। মেজোপিসি এসেছেন। মামনির কাছে বিবাহযোগ্য পাত্রীর খোঁজ করেন পরিচিত কারোর জন্য। ভালো মানুষ মামনি তার এক বান্ধবীর নাতনীর কথা বলেন, যার মা ডিভোর্সী, ডাক্তারের কন্যা। মেজোপিসি ঝাঁঝিয়ে বলে ওঠেন, ‘ডিভোর্সী মায়ের মেয়ের সঙ্গে আমি সম্মত করি না। কাকিমা পিয়ালীর থালা নিয়ে পিয়ালীকে সঙ্গে করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু কথাটি পিয়ালীর বুকের ভিতরে ঢুকে বুক চিরে অতলে গিয়ে বসে গেল। কোনোদিন এই কথাটা আর ভুলতে পারেনি পিয়ালী।

কম্পিউটার ক্লাসের একটি ছেলের কাছ থেকেই জানতে পারে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার সুযোগ, সুবিধা ও ব্যবস্থার কথা। পিয়ালি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। নিজের কিছু টাকা নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যায় অস্ট্রেলিয়ায়। শিক্ষিকার ট্রেনিং নিয়ে শুরু করে ছোটোদের পড়ানো মেলবোর্ন শহরে। এখানে পিয়ালি ডিভোর্সী বলে ভুরু কুঁচকানো বা চোখের ইশারায় কোনো ব্যঙ্গাত্মক ব্যবহার পায় না।

কিছু শিক্ষিকা বন্ধুদের সঙ্গে পিয়ালী ক্রিসমাসের ছুটিতে সিডনী বেড়াতে আসে। এত গরমে সকলেই বোধহয় ‘অপেরা হাউস’ দেখতে এসেছে। বড্ড ভীড়, পিয়ালী গুটি গুটি ‘ওপাল হাউস দোকানে ঢোকে। ওপাল ওর জন্ম মাসের পাথর। ছোট দুটির সঙ্গে একটি অপেক্ষাকৃত বড় পাথর ফ্রী তে পাওয়া যাচ্ছে একটু বেশি দাম দিলেই। পিয়ালী হাতের কাছে নিয়ে দেখতে থাকে।

‘হঠাৎ আমেরিকান উচ্চারণে, “It suits you”, শুনে চমকে তাকায়, “thank you” , বলে একটু হাসে। দীর্ঘাঙ্গী ভদ্রলোক, তীক্ষ্ণ মুখাবয়ব। পাথর তিনটে কিনে ফেলে পিয়ালী , বেরিয়ে আসে। বন্ধুরা তখন এদিক ওদিক ঘুরছে। একটি চেয়ারে বসে বই খোলে পিয়ালি। একটু পরেই “May I?” , সেই একই কণ্ঠস্বর, না তাকিয়েও বোঝে, সেই আমেরিকানটি। “oh sure!” বলে পিয়ালি। সেই শুরু, পীটার কর্মসূত্রে এসেছে অস্ট্রেলিয়ায়, কয়েকমাস পর ফিরে যাবে। ফোনে এবং মাঝে মাঝেই পীটারের মেলবোর্নে আসা যাওয়ার ফলে, পিয়ালীর মনের ভিতরের সব কথা খুলে বলতে পারে কাউকে এতদিন পর।

পীটারের ফিরে যাবার সময় হচ্ছে, পিয়ালীর মনে হয় পীটারের কোনো কিছুই ও জানাতে চায়নি, পীটার ও বলেনি। লজ্জায় পড়ে পিয়ালী, জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারে, পীটারের ডিভোর্স হওয়ার কথা। মেয়ে বড় হবার মুখে ডিভোর্স। এখন শুধু মেয়েকে কাছে পায় নিয়মমাফিক। পীটারও মনের কথা অনেক বলে। ফিরে যাবার দুদিন আগে প্রথমত পীটার পিয়ালীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। পিয়ালী খতমত খেয়ে, নিজেকে সংযত করে, আস্তে করে সম্মতি জানায়। পীটার চলে যায় ডেইটনে। ফোন ও ই-মেলে যথারীতি যোগাযোগ থাকে। পিয়ালী ভাইদের মাধ্যমে বাড়িতেও জানায়।

নানান আপত্তি জনক এবং ভয় ধরানোর কথা আসে। কিন্তু পিয়ালী ঠিক করে দেশে গিয়ে ওরা বিয়ে করবে, তাতে যদি বাড়ির কেউ সম্মতি দেয় আসবে না-হলে নিজেরাই বিয়ে করে, দেশেই কোথাও হনিমুন করে ফিরবে। আর কাউকে খুশি করার জন্য নিজের গায়ে দাগ লাগাবে না। বাড়ির সকলেরই মত পাল্টায় পীটারকে দেখে ও তার ব্যবহারে। হনিমুন সেরে পিয়ালী যায়

অস্ট্রেলিয়ায়, পীটার যায় আমেরিকায়।

দেড়মাস পর পিয়ালী পৌঁছায় আমেরিকার ওহাইও'র ডেটন-এ, যেখানে পীটারের বাড়ি। পিয়ালী আসার পর রোজ্যায়ানও পীটারের কাছে আসার সময়টা বাড়তে থাকে। পীটারও খুশি হয়। রোজ্যায়ানের সঙ্গে পিয়ালীর খুব সুন্দর সম্পর্ক হতে থাকে, পীটার যেমন আশা করেছিল। কিন্তু পিয়ালীর একটা ব্যাপার ভাল লাগে না, রোজ্যায়ান কোন ভুল করলে, তা শুধরে দিতে গেলে বা প্রতিবাদ করলে, পীটার খুশি হন না। পিয়ালীর অবাক লাগে, ছোটদের ভুলটা যদি না বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ছোটরা কোনটা ভুল কোনটা ঠিক - এর মধ্যে পার্থক্য বুঝবে কি করে। এই ব্যাপারে পীটারের সঙ্গে পিয়ালীর মতবিরোধ ছাড়া ওদের দিন ভালই কাটে। এর মধ্যেই পাঞ্চলী আসে ওদের কোলে। পিয়ালী ও পীটারের শিশুকন্যা। ঝলমলে হাসিখুশি মেয়ে পাঞ্চলী। 'দিদি বলতে অজ্ঞান। দিদি ও বোন ছাড়া থাকতে পারে না। ইউনিভার্সিটির ছুটির তিনভাগের একভাগ কাটায় নিজের মায়ের কাছে, বাকি সময় থাকে পীটার, পিয়ালী, পাঞ্চলীর সঙ্গে। ওর ঘরেই পাঞ্চলীর যত দৌড়ঝাঁপ, পিয়ালীর শাসনের বাইরে এই ঘরটা পাঞ্চলীর। পাঞ্চলী দিদির আদর ছাড়া কিছু বোঝে না।

এর মধ্যে পিয়ালী দেশের খবরও জানতে পারে। মেজোপিসির পরিবারে বেশ কটি ডিভোর্স হয়েছে ও হচ্ছে। পিয়ালীর বুক কেঁপে যায়, কার জন্য এরা শাস্তি পাচ্ছে। রোজ্যায়ানের বিয়ে ঠিক হয়। ব্রিটিশ যুবক, এখানে পড়তে এসেছিল, এখানেই থেকে গিয়েছে। ছেলেটির বাবা, মা, কাকা ও দিদি উড়ে এসেছিলেন বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য। রোজ্যায়ান পিয়ালীর উপর দায়িত্ব দিয়েছিল অনুষ্ঠানের সকল কিছু ব্যবস্থাপনার, পিয়ালী তার ক্ষমতানুযায়ী যতটা পেরেছিল করেছিল। বিয়ের পর রোজ্যায়ানের মা পিয়ালীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে রেখে বলে গেল, 'এখন বুঝলাম রেজওয়ানা তোমাদের কাছে কেন এত থাকতে চাইতো। ভালো থেকে তোমরা।'

এর পরে পিয়ালী কাকু ও বাবাকে হারায়। কিন্তু তার থেকেও বড় একজন, যাকে পিয়ালী বড্ড শ্রদ্ধা করে সেই 'জামাই বাবু'ও হঠাৎ ছয় মাসের মধ্যে চলে যান। পিয়ালীর এই দুঃখকে সামলাতে অনেক সময় লাগে। মেয়েতো চুপ করে থাকে। পিয়ালী মেয়ের জন্য বেড়ানো ছাড়া সারাক্ষণ বাড়িতেই বসে থাকে আর চোখের জলে ভাসে। পীটার অনেক বেশি সঙ্গ দেয় পিয়ালীকে ভোলাবার জন্য। সব সময় পিয়ালীর দিদিভাইয়ের বিয়ের দিনে মেজোপিসির শুধু শুধু দিদিভাইকে কাঁদানোর দুঃখটা মনে পড়ে। সেই থেকেই একটা বিতৃষ্ণা জন্মায় মেজোপিসির উপর, যা কাউকে কোন দিন বোঝাতে পারে নি পিয়ালী।

আজ পাঞ্চলীর বিয়ে - সকলে উড়ে এসেছেন দেশ বিদেশ থেকে। দিদিভাইও, ছেলে পরিবার নিয়ে। বিয়ের প্রস্তুতিতে সকলেই ব্যস্ত। পাত্র হিন্দু বাঙালি আমেরিকান। কন্যাদান করবে পীটার, প্রস্তুতি অনেকদিন ধরেই করছে।

পিয়ালী মেয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে ঠাকুর ঘরের দরজা খুলে ঠাকুরের সামনে বসে, মেয়ে জামাইয়ের জন্য আবার ও প্রার্থনা করে। নিজের মনের মধ্যেই বলে ওঠে, 'অন্যায়কে মুখ বুজে সহ্য না করে তার প্রতিবাদ করে ডিভোর্স করা কোন অপরাধ নয়। ডিভোর্সী মেয়েকে ছোট নজরে দেখে তাকে কষ্ট দেওয়া ও তার সঙ্গে ভুল ব্যবহার করা অনেক বড় অপরাধ।' বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে, মুখে হাসি ফুটিয়ে ঠাকুরের সামনে থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে, নীচে নেমে এসে বরের আসন 'চেয়ারটি সাজাতে ব্যস্ত হয় পিয়ালী।।

নদীর ধারের শিশুটি

প্রদীপ চোন্দার

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বয়ে আসা একটি সত্য গ্রামবাংলার ভূতের গল্প

স্মৃতির অন্ধকার পথ ধরে

অনেক গল্প সময়ের স্রোতে হারিয়ে যায়। দাদু-ঠাকুরদাদের স্মৃতিতে বেঁচে থাকে, শীতের রাতে আগুন পোহাতে পোহাতে কিংবা জ্যোৎস্নাভেজা আকাশের নিচে বারবার বলা হয়, যতদিন না আর কেউ সেগুলো বলার জন্য বেঁচে থাকে। এটি তেমনই একটি গল্প।

এই গল্পটি আমার প্রপিতামহ তাঁর ছেলেকে, অর্থাৎ আমার দাদুকে বলেছিলেন। দাদু গল্পটি আমার বাবাকে বলেন, আর আমার বাবা আমাকে। ভূতে বিশ্বাস করা বা না করা ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু আমাদের পরিবারে এই ঘটনাটি সবসময় একটি সত্য ঘটনা হিসেবেই বলা হয়েছে, যা বহু দশক আগে ঘটে ছিল, যখন গ্রামের জীবন আজকের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।

তখন বিদ্যুৎ ছিল না, হাতঘড়ি ছিল না, দূরবর্তী গ্রামে যাওয়ার বাস ছিল না। মানুষ সময় বুঝত সূর্যের অবস্থান, মোরগের ডাক এবং রাতের নানান শব্দ শুনে। সূর্যাস্তের পর গ্রামের অন্ধকার ছিল গভীর ও রহস্যময়। এটি সেই রাতের গল্প, যেদিন আমার প্রপিতামহ এক মৃত শিশুর আত্মার মুখোমুখি হয়েছিলেন।

গ্রাম

আমার প্রপিতামহ যে যুগে বাস করতেন, সে যুগ আজ কল্পনার মতো মনে হয়। মাটির দেয়াল ও খড়ের চালের ঘর, চারপাশে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত, বাঁশঝাড়, পুকুর আর নদী নিয়ে গড়ে উঠেছিল সেই গ্রাম। বর্ষাকালে ক্ষেতগুলো সবুজ সমুদ্রে পরিণত হতো। শীতকালে পাকা ধানের সোনালি রং দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকত। গ্রামের প্রবেশপথে বিশাল বট ও অশ্বখ গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকত। রাতে বাতাস বইলে বাঁশঝাড়ে অদ্ভুত ফিসফিস শব্দ হতো, যেন কেউ অন্ধকারে কথা বলছে।



প্রতিটি বাড়ির পাশে ছোট পুকুর ছিল। সন্ধ্যায় মহিলারা সেখানে জল আনতে যেতেন, শিশুরা খেলাধুলা করত। নদী ছিল গ্রামের প্রাণ। মাছ ধরা, চাষাবাদ, জ্ঞান, সবকিছুর সাথে নদীর সম্পর্ক ছিল। রাত নামলে গ্রাম যেন অন্য এক জগতে পরিণত হতো। কেরোসিনের বাতি ও প্রদীপ ছাড়া আর কোনো আলো ছিল না। অমাবস্যার রাতে এত অন্ধকার হতো যে নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যেত না।

শেয়ালের ডাক, ঝাঁঝিঁ পোকাকার শব্দ, দূরে পেঁচার ডাক, আর বাতাসে পাতার মর্মর ধ্বনি অনেক সময় মানুষের পদশব্দ বলে মনে হতো। সেই সময়ে ভূতের গল্প ছিল গ্রামের জীবনেরই একটি অংশ।

শিশুটির মৃত্যু ও দাফন

একদিন গ্রামের একটি ছোট শিশু আকস্মিকভাবে মারা যায়। তার জীবন সত্যিকারের শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যায়। খবরটি দ্রুত পুরো গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। শিশুটির মায়ের কান্না গোটা গ্রামকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। গ্রামবাসীরা সবাই শোকে ডুবে গিয়েছিল। তখনকার দিনে গ্রামবাসীরা এক পরিবারের মতো জীবনযাপন করত। একজনের দুঃখ সবার দুঃখ ছিল।

আমার প্রপিতামহ ছিলেন গ্রামের সম্মানিত ব্যক্তি। তিনিও শিশুটির শেষকৃত্যের কাজে অংশ নেন। বিকেলের দিকে গ্রামের মানুষ শিশুটিকে নদীর ধারের কবরস্থানে নিয়ে যায়। প্রাচীন গাছপালায় ঘেরা সেই স্থানে শিশুটিকে দাফন করা হয়। নদী পাশে নিঃশব্দে বয়ে চলেছিল। শিশুটির কবর মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়ার সময় আমার প্রপিতামহের মনে গভীর দুঃখ জন্মায়। একটি জীবন, যা শুরুই হতে পারেনি। সন্ধ্যার মধ্যে সবাই বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু সেদিনের শোক যেন গ্রামের আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল।

অন্ধকারে একটি ভুল

পরদিন আমার প্রপিতামহের মেয়ের বাড়ি যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। মেয়ের বিয়ে হয়েছিল দূরের এক গ্রামে। সেখানে পৌঁছাতে পাঁচ-সাত ঘণ্টা হাঁটতে হতো। তিনি ভোরের আগে রওনা হতে চেয়েছিলেন। সেদিন রাতে ঘরে কোনো ঘড়ি ছিল না। রাতের কোনো এক সময়ে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি ভেবেছিলেন ভোর হয়ে এসেছে। লাঠি হাতে, গায়ে শাল জড়িয়ে, পবিত্র ব্রাহ্মণসূত্র পরে তিনি পথ ধরলেন। বাইরে বেরিয়ে দেখলেন চারপাশে ঘন অন্ধকার। মোরগ ডাকেনি। কোনো মানুষ জেগে ওঠেনি। কুকুর পর্যন্ত ডাকছে না। তবু তিনি হাঁটা শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি নদীর ধারের সেই পথটিতে পৌঁছালেন, যেখানে কয়েক ঘণ্টা আগে শিশুটিকে দাফন করা হয়েছিল। হঠাৎ নদীর দিক থেকে কনকনে ঠান্ডা বাতাস বয়ে এলো। তাঁর ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। কিন্তু তিনি থামলেন না।

কান্নারত শিশুটি

কিছু দূর যাওয়ার পর তিনি একটি শব্দ শুনলেন। প্রথমে মনে হলো বাতাসের শব্দ। তারপর আবার শুনলেন। একটি শিশুর কান্না। তিনি থেমে গেলেন। চারদিকে তাকালেন। কেউ নেই। আবার হাঁটতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। "আমাকে সাহায্য করো..." তিনি থমকে দাঁড়ালেন। কণ্ঠটি ছিল একটি ছোট শিশুর। "আমাকে কোলে নাও..." "আমি ক্লান্ত..." "আমাকে ফেলে যেও না..." তিনি চারদিকে দেখলেন। কেউ নেই। তবু কণ্ঠস্বরটি যেন ঠিক তাঁর পেছনে। তিনি যত দ্রুতই হাঁটেন, শিশুটির কণ্ঠ ততই কাছে শোনা যায়। ধীরে ধীরে তাঁর মনে ভয় জন্মাতে শুরু করল। এরপর তিনি হঠাৎ উপলব্ধি করলেন একটি ভয়ঙ্কর সত্য।

তিনি অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছেন। কিন্তু ভোরের কোনো চিহ্ন নেই। আকাশ এখনো ঘন কালো। পাখিরা ডাকছে না। আলো ফুটছে না। তখনই তিনি বুঝলেন। এখনো গভীর রাত। আর তাঁর পেছনে যে শিশুটি হাঁটছে, সে কোনো জীবিত শিশু নয়। নদীর ধারে কবর দেওয়া সেই শিশুর আত্মা।

দীর্ঘ পথযাত্রা

ভয়ে তাঁর বুক কাঁপছিল। কিন্তু তিনি পেছনে তাকানোর সাহস করলেন না। উল্টো উচ্চস্বরে বললেন, "আমার হাতে শক্ত লাঠি আছে!" "আমার গায়ে পবিত্র ব্রাহ্মণসূত্র আছে!" "কাছে আসিস না, আমার হাতে লাঠি আছে, কাছে এলে তোকে মারব।"

তিনি বারবার এই কথাগুলো বলতে লাগলেন। কখনো চিৎকার করে। কখনো প্রার্থনার মতো ফিসফিস করে। কান্নার শব্দটি

তাঁর পেছনেই রয়ে গেল। মাঝে মাঝে মনে হতো ছোট ছোট পায়ের শব্দও শুনতে পাচ্ছেন। টুপ.....টুপ.....টুপ.....একবার তো মনে হয়েছিল কেউ তাঁর ধুতির পেছনটা টেনে ধরেছে। কিন্তু তিনি একবারও পেছনে তাকাননি। শুধু ঈশ্বরের নাম জপ করতে করতে হাঁটতে থাকলেন।

মেয়ের গ্রামের কাছে

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হওয়ার পর পূর্ব আকাশে হালকা আলো দেখা দিল। তাঁর মনে আশার আলো জাগল। কিন্তু ততক্ষণে তিনি সম্পূর্ণ ক্লান্ত। হঠাৎ তাঁর শ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল। মনে হচ্ছিল অদৃশ্য কোনো হাত তাঁর গলা চেপে ধরেছে।

শিশুটির কণ্ঠস্বরও বদলে গিয়েছিল। এবার আর কান্না নয়। কেবল রাগ। "তুমি আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।" "আমি তোমার সঙ্গেই যাব।" অবশেষে তিনি দূরে একজন মানুষকে দেখতে পেলেন, যিনি ভোরবেলা পুকুরের দিকে যাচ্ছিলেন। প্রাণপণে তিনি ডাকতে চাইলেন। কিন্তু গলা দিয়ে শুধু একটি শব্দ বের হলো। "বাঁচাও..." লোকটি তাঁকে দেখে দৌড়ে এলো।

ঠিক তখনই তিনি শেষবারের মতো শিশুটির কণ্ঠ শুনলেন। "আজ তোমাকে ছেড়ে দিলাম।" "তুমি খুব ভাগ্যবান।" "ও লোকটা না এলে তুমি আমার সঙ্গেই যেতে।" এরপরই কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল। শ্বাসরোধের অনুভূতিও চলে গেল। আর তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

উদ্ধার ও সুস্থতা

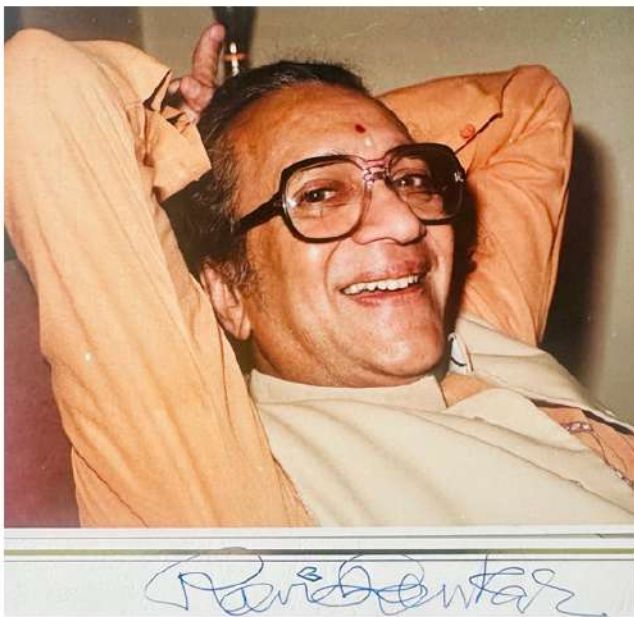
গ্রামবাসীরা তাঁকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যায়। সারা শরীর ঘামে ভেজা ছিল, মুখ ফ্যাকাসে, আর শরীর কাঁপছিল। প্রায় সারাদিন পর তিনি সুস্থ হয়ে ঘটনার বর্ণনা দেন। তিনি বলেন নদীর ধারের কবর, শিশুর কান্না, অন্ধকার পথ, অদৃশ্য পদশব্দ এবং সেই ভয়ঙ্কর যাত্রার কথা।

সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনেছিল। কেউ হাসেনি। কেউ তাঁকে অবিশ্বাস করেনি। অনেক বৃদ্ধ গ্রামবাসী বলেছিলেন, আকস্মিকভাবে মারা যাওয়া মানুষের আত্মা কখনো কখনো কিছুদিন অশান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। কেউ কেউ বলেছিলেন, তাঁর ব্রাহ্মণসূত্র এবং ঈশ্বরের নাম জপই তাঁকে রক্ষা করেছিল। বহু বছর ধরে এই গল্প আশেপাশের গ্রামগুলোতে প্রচলিত ছিল।

অন্ধকার রাতের উত্তরাধিকার

আজ আমরা বিদ্যুৎ, মোবাইল ফোন, ঘড়ি এবং আধুনিক যানবাহনের যুগে বাস করি। এক সময় যে পথ হেঁটে যেতে পাঁচ ঘণ্টা লাগত, আজ তা কয়েক মিনিটেই পার হওয়া যায়। তবু এ ধরনের গল্পের গুরুত্ব আজও আছে। এগুলো কেবল ভূতের গল্প নয়। এগুলো আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবন, বিশ্বাস, ভয় এবং অভিজ্ঞতার এক অমূল্য দলিল। এই গল্পটি কোনো বইয়ের গল্প নয়। এটি আমার প্রপিতামহের নিজের অভিজ্ঞতা। তিনি আমার দাদুকে বলেছিলেন। দাদু আমার বাবাকে বলেছিলেন। বাবা আমাকে বলেছেন। আর আমি সেটি লিখে রাখলাম, যাতে সময়ের সাথে হারিয়ে না যায়।

আজও যখন আমি সেই পুরনো গ্রামের কথা কল্পনা করি, নদীর ধারে নিঃশব্দ কবরস্থান, মধ্যরাতের বাতাসে দুলতে থাকা বাঁশঝাড়, আর কুয়াশাচ্ছন্ন পথের কথা ভাবি, তখন মনে হয় যেন সেই শিশুটির কান্না এখনো দূর থেকে ভেসে আসছে। একটি শিশু, যার সেখানে থাকার কথা ছিল না। আর হয়তো সেই কান্নার প্রতিধ্বনি এখনো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বয়ে চলেছে।



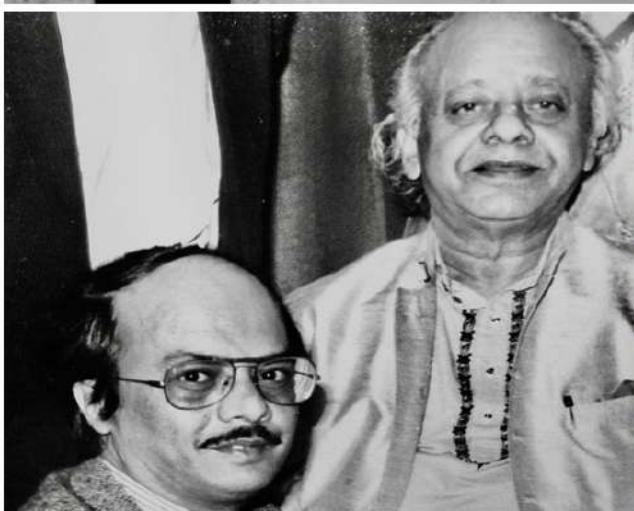
A Legacy in Memories

6/4/1984. The day I met Ustaad Alla Rakha was Pandit Ravi Shankar's 65th Birthday. So the Ladies of Rochdale cooked dinner for the guests and made a beautiful cake with a replica of a Sitar, which was quite unique and very appropriate. After the usual ceremony all the guests enjoyed the cooked Bengali cuisine. By this time Pandit ji had a hectic day. After his long performance at the Gracie Fields Theatre and his Birthday party celebration, naturally tired post prandial. While he was resting in a couch I took one picture which is one my favourites. Some years later in Alhambra Bradford, I saw him after his concert and I requested his signature on the image I took, He obliged and liked it very much and requested a copy for himself. Unfortunately I couldn't fulfil that. He was taken ill in California and the rest is all history.

I hope you like my story.



Dr Kamal Samanta



A Journey of Excellence, Leadership and Service

Professor Jaydip Ray

Deputy Lord Lieutenant for South Yorkshire

Professor of ENT

Consultant ENT Surgeon

Background / Career Path

I came over to the UK after completing my master's in ENT Surgery from Kolkata. I started at St Thomas' Hospital, London, and soon moved to Cambridge to research hearing loss and cochlear implants. I was very fortunate to have excellent and supportive teachers and mentors all the way through. Two prestigious fellowships in Sydney, Australia, and Stanford, USA, soon followed. This helped me to build a good foundation in surgery and clinical research. That, in turn, enabled me to develop a leading clinical academic unit in Sheffield with international research collaborations. I was made Professor at both the University of Sheffield and Sheffield Hallam University in 2012. In addition, I have held many senior leadership roles at a national level and have supported various community and charity organisations pro bono.

Other Roles



I am currently the Deputy Lord Lieutenant for South Yorkshire and support the Lord Lieutenant as the direct representative of the Monarch in the county. In addition, I served as the High Sheriff for South Yorkshire from 2023 to 2024. These roles are a huge honour and privilege but carry enormous responsibilities, ranging from supporting public, private and voluntary sector units, the judiciary, police and emergency services, to organising Royal visits to the county. It is also enlightening to see how many people do amazing work to help others without expecting anything in return. I

have recognised many such individuals and organisations through the High Sheriff's Awards and recommended many for Royal awards.

I have joined the boards of Sheffield Hallam University and Sheffield Children's Hospital and have also trained as a Magistrate, providing a variety of experiences which are both exciting and interesting. Most recently, I received the Freedom of the City of London, a quirky and unique custom going back over 800 years.

How Do You Manage Time?

One has to master the art of spinning many plates without dropping them. Good diary management, efficient secretarial support and an understanding family help significantly.

How Do You Relax?

I have many hobbies, including music, painting, reading and travel. Being Bengali, I cherish a jolly good ‘adda’ — the best stress buster in the world.

Advice to the Younger Generation

It is crucial to dream big and aim high, stay positive and do what you enjoy. The traditional Indian virtues of diligence, tenacity, resilience and hard work are assets we all possess through our rich heritage. I strongly believe in the saying from the Bhagavad Gita where Lord Krishna says to Arjuna, “You only have control of your actions; the results will follow.” As a corollary, you will succeed in your ventures if you are good at your work and care about others.



কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা

সুবীর সেন



একী কাণ্ড! আমি তো উড়তে পারছি! কোনো পাখা লাগছে না, কোনো ডানা নেই—তবু দিবি হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছি। কী সুন্দর চট করে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলাম—কোনো দরজা খোলার ঝামেলাই নেই! বেডরুমের পাশের ঘরের জানালা দিয়ে ডানা-কাটা পরীর মতো সটান গলে বেরিয়ে এলাম। তাহলে কি আমি... ভূত হয়ে গেলাম নাকি? যাক গে! যাই হই না কেন, এখন যে উড়তে পারছি—সেটাই তো আজকের দিনের সেরা পাওয়া! কিন্তু দাঁড়াও... বাইরে তো বেশ জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়ছে। অথচ আমার তো একটুও শীত করছে না!

আচ্ছা, একটু পরীক্ষা চালিয়ে দেখি। সামনের ওই ঢাঙা গাছটার কাছে উড়ে যেতে পারি কি না। অ্যাঁ! সত্যি তো! আমাকে তো এক ফোঁটাও হাঁটতে হচ্ছে না! কী দারুণভাবে ভাসতে ভাসতে সোজা গাছটার মাথায় উঠে এলাম। এত উঁচু গাছে জীবনে কোনোদিন উঠতে পারিনি বাবা! বাহ! কতগুলো পাখির বাসা হয়েছে এখানে। কিন্তু অবাক কাণ্ড—পাখিগুলো আমাকে দেখে

একটুও ভয় পাচ্ছে না! হুমম... আমাকে তো প্রতিদিনই দেখে। খাবার আর জল দিই। নিশ্চয়ই ভাবছে, “লোকটা আমাদেরই একজন!”

এ কী হলো

আজ আবার রবিবার, মানে আজ কাজের চাপ নেই। ভেবেছিলাম একটু প্রাথমিক যাব... কিন্তু ধুর! হাঁটব কেন? আমি তো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছি! তার মানে এখন আমার অবস্থা পুরোপুরি: কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা... ভাবছি, উড়ে ইন্ডিয়া ঘুরে আসি? না থাক... আজ আর ট্রাই করব না, এত দূর উড়ে যেতে গিয়ে শরীর এলিয়ে পড়বে। কাল বরং দেখা যাবে। আজ এই আশেপাশেই একটু উড়ে বেড়াই। সকালে হাঁটতে বেরিয়ে এমন একটা ঘটনা ঘটল, যা নিয়ে এখন আমার নিজের অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ হচ্ছে! দেখি, আমার প্রতিবেশী সেই ভদ্রমহিলা তাঁর কুকুরটাকে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছেন। দূর থেকেই হাসিমুখে বললাম—“Good Morning!” তারপর দাঁড়িয়ে রইলাম... এক সেকেন্ড... দুই সেকেন্ড... তিন সেকেন্ড... কোনও উত্তর নেই! আমি ভাবলাম, হয়তো শুনতে পাননি। আমি আবার কুকুরটার দিকে তাকালাম। ভাবলাম, কুকুরটাও আমাকে দেখল... তারপর লেজ নাড়ল না, ঘেউ ঘেউ করল না, এমনকি সেই চিরচেনা কুকুরসুলভ “এই লোকটা কে?” মার্কী তাকানিটাও দিল না কাল পর্যন্ত তো সব ঠিকঠাক ছিল! হঠাৎ মাথায় একটা সন্দেহ ঢুকল—আচ্ছা, ওরা কি আমাকে দেখতে পাচ্ছে না? আবার মনে হল, আমার কথা বোধহয় শুনতে পাচ্ছে। কারণ “Good Morning” বলার পর ভদ্রমহিলা একবার চারদিকে তাকালেন। তারপর এমন দ্রুত হাঁটা শুরু করলেন, যেন সকালবেলার হাঁটা নয়—কোনও অদৃশ্য আতঙ্কের হাত থেকে পালানোর প্রতিযোগিতা। আমি কি তাহলে ‘The Invisible Man’ হয়ে গেছি? মানে ব্যাপারটা বেশ সুবিধার! লোকজন আমাকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু আমি সবাইকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমি কথা বলছি, তারা শুনতেও পাচ্ছে... শুধু আমাকে দেখতে পাচ্ছে না! এ তো দেখছি বিরাট ক্ষমতা! তার ওপর আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম—আমি কোনও রকম শারীরিক পরিশ্রম ছাড়াই বেশ দ্রুত এগিয়ে যেতে পারছি! আর এখানেই শেষ নয়... বলতে একটু লজ্জাই হচ্ছে... আজ ভদ্রমহিলার সঙ্গে যখন কথা বলতে গেলাম, তখন মনে হলো—আমার চোখ দুটো যেন একেবারে X-Ray Eyes, নিজের চোখ দিয়েই যেন হৃদয়ের একেবারে গভীর অবধি দেখতে পাচ্ছি। আমি তো নিজেই ঘাবড়ে গেলাম! লজ্জায় সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিলাম। নিজের চোখকে মনে মনে বললাম—“এই যে ব্যাটা, বেশি বাড়াবাড়ি করিস না। বেশি Smart হওয়ার দরকার নেই। X-ray vision পেয়েছিস বলে যা খুশি দেখবি নাকি?” আর তখনই মাথায় বিজ্ঞাপনের সেই বিখ্যাত লাইনটা ভেসে উঠল—“Men will be men!”। তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজের চরিত্রের certificate নিজেই দিয়ে দিলাম—“না না, আমরা ভদ্রলোক মানুষ... চোখের ভুল হয়েছে!” তারপর থেকে চোখকে কড়া নির্দেশ দিয়েছি—সামনে মহিলা দেখলে আগে Good Morning, তারপর চোখ নিচে।

তবে জটায়ুর মতো বলতে ইচ্ছে করছে—আপনাকে তো Cultivate করতে হচ্ছে মশাই!

সত্য, সেলুকাস! কি বিচিত্র এই দেশ!

সকাল সকাল ইংল্যান্ডের রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা, বিশেষত উইকএন্ডে। বাড়ির সামনে বসে থাকলেও সারাদিনে লোক গুনে গুনে হয়তো দুটো, বড়জোর তিনটে,

কলকাতায় তো ব্যাপারটা একেবারে উল্টো। গড়িয়াহাট বা যাদবপুরের মোড়ে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকুন—Entertainment-এর জন্য আর কোনও OTT subscription-এর দরকার নেই। হঠাৎ দেখবেন কোথা থেকে দুজন এসে মারপিট শুরু করে দিল! যারা মারপিট শুরু করেছিল, তারা কিছুক্ষণ পর নিজেরাই চলে গেল। কিন্তু আসল মজা তখন! যারা পরে এসে দাঁড়িয়েছিল, তারা ভাবল—“আরে, মারপিট শুরু হয়ে গেছে যখন, এত তাড়াতাড়ি শেষ হতে দেব কেন” তারপর তারাও দু-চারটে ঘা মেরে গেল! একেবারে Live Bengali Entertainment! কোনও ticket নেই, কোনও booking নেই, শুধু বসুন আর দেখুন। আর যদি চায়ের দোকানে গিয়ে বসেন, তাহলে তো বুঝবেন—আপনি আসলে কত কম জানেন। লোকজন একটানা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর এমন জ্ঞান দিয়ে যাবে, মনে হবে—Encyclopedia আর Artificial Intelligence-ও ওদের জ্ঞানের সামনে fail.

ইংল্যান্ডের আরেকটা জিনিস আমাকে বড় অবাক করে এখানে গরমকালে সূর্যবাবু যেন Overtime করেন! আবার শীতকালে? সূর্যবাবুর Time-off! ছয় ঘণ্টার মতো দিনের আলো,

গরমকালে এখানকার লোকজনের পোশাক-আশাক —চোখের জন্য সত্যিই বেশ আরামদায়ক ব্যবস্থা! আর শীতকাল এলেই আবার উল্টো কাণ্ড! একটার ওপর একটা লেয়ার—T-shirt, Sweater, Jacket, Coat... সব চাপিয়ে এমন অবস্থা যে মানুষটাকে আর মানুষ বলে চেনাই যায় না!

দূর থেকে দেখলে মনে হয়-একটা আস্ত কাপড়ের বস্তা হেঁটে যাচ্ছে যেন।

সত্যি বলতে কী—এই দেশটা মাঝে মাঝে এমন Depressive লাগে যে, মনে হয় Depression-ও এখানে এসে Permanent Resident হয়ে গেছে! তাই বোধহয় এখানে মনোবৈজ্ঞানিক সমস্যা এত বেশি, আর মনোবিজ্ঞানীদেরও এত রমরমা! আবার কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী বন্ধুকে দেখলে মনে হয়, কাউন্সেলিংটা বোধহয় ওঁদেরও দরকার। আমার তো মনে হয় এই Depression আর শুধু মানুষের মধ্যে নেই-বাড়ি বাড়ি ঢুকে গেছে! তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই ইংল্যান্ডে এখন একে একে শুরু হয়ে গেছে—দোল, রথযাত্রা, পিঠে-পুলি, ইলিশ উৎসব, যিশু পুজো—সবই! মনে হচ্ছে, উৎসবের আড়ালে সবাই মিলে ডিপ্রেসন কাটানোর মহাযজ্ঞে নেমেছে। হয়তো আর ক’দিন পর ঝুলন, কার্তিক পুজো, ইতু পুজোও শুরু হবে!

কয়েকদিন ধরে গরমটা বেশ জেঁকে বসেছে। পার্টিতে আমাদের বাঙালিদের পোশাক দেখে তো আমি প্রায় ভিমরি খেয়ে গেলাম! ও বাবা! England-এর গরম বোধহয় সত্যিই সাংঘাতিক জিনিস। যাক, সে প্রসঙ্গ আর না বাড়ানোই ভালো। এই তো আগের সপ্তাহেই একটা বাঙালির পার্টিতে গিয়েছিলাম। আমাদের বন্ধুরা সবাই Coat-Tie পরে এমন Proper English Gentleman সেজে এসেছে, যেন একটু পরেই Parliament-এ Budget পেশ করবে।

আমি ভাবলাম—“বাহ! এরা তো পুরোপুরি সাহেব হয়ে গেছে!”

কিন্তু মিনিট দশেক পরেই Coat-Tie একপাশে রেখে হাত দিয়ে ভাত-মাছ খেতে শুরু করল।

তখন বুঝলাম—Dress Code London, Food Court Kolkata!

আমার বাড়িতেও অবশ্য কম কাণ্ড হয় না। মনে হয় Salman মাছের আত্মা কোথাও বসে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে, যখন দেখে ফুলকপি আর আলু দিয়ে English মাছের Bangaliঝোল রান্না হয়েছে! যাই হোক, আবার সেই পার্টির কথাতেই ফিরে আসি। কিন্তু আসল নাটক তো তখনও বাকি! হঠাৎ দেখি—পার্টিতে উপস্থিত দুজন Arch-rival! এরা একে অপরকে দেখলেই এতদিন এমন ভাব করত, যেন একজন আর একজনের জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু। আমি মনে মনে প্রমোদ গুনলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখি—দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে। তার কিছুক্ষণ পরে দেখলাম, দু’জন দু’মুখো হয়ে নিজের নিজের দল নিয়ে গল্প করছে।

আমি তো একেবারে হতবাক সবই কি মেকি, শুধু লোক দেখানো? মনে মনে বললাম—সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ! আর সবচেয়ে বিচিত্র প্রাণী? মানুষ মশাই... মানুষ।

হাওয়া হাওয়া এ হাওয়া

আজ আমার মনটা দারুণ ফুরফুরে।

আমি উড়তে পারছি, X-ray Eyes পেয়েছি—Added Bonus! এক নিমেষে যেখানে খুশি উড়ে চলে যেতে পারি। মনে হলো, যেন হাতে পরশপাথর পেয়েছি!

একটা কাপও হাতে তুলে ফেললাম। ভাবলাম, নিশ্চয়ই জীবনে দু-একটা ভালো কাজ করেছিলাম—তারই পুরস্কার হয়তো এবার হাতে-নাতে পেলাম। ভূতের রাজার বর নিশ্চয়ই নয়—কে আর ভূত গণনার আগে ভূত সংখ্যা বৃদ্ধি করবে?

তারপর মাথায় এল—যাতায়াতের খরচ নেই, Plane-Taxi নেই, জামাকাপড়ের খরচ নেই!

আর যদি ATM-এ ঢুকে টাকা তুলে নিই? CCTV-ও আমাকে দেখতে পাবে না!

কোনো প্রমাণ নেই, কোনো সাক্ষী নেই, আসামিও নেই! অফিসে যাওয়ার তাড়াও নেই—Just chill out!

হঠাৎ মাথায় এল এক দুর্দান্ত Business Idea—“Hawa Hawa Services Limited”! Invisible Man Services—কারও শত্রুকে একটু ভয় দেখাতে চান? সুপারি দিন, শুধু নাম আর Location দিন—বাস, হাজির!

আর সঙ্গে থাকবে Premium বশীকরণ Service—England-এ বসেই Hawa Hawa Baba Service! এমন ভয় দেখাব যে Baba to আত্মারাম খাঁচাছাড়া—একই ছাদের তলায়! তারপর কয়েক মাসের মধ্যেই Billionaire List-এ আমার নাম! আমার Punch Line একটাই—“আগে ব্যবহার করুন, তারপর বিশ্বাস করুন!” —Hawa Hawa-তে অবিশ্বাসের কোনো জায়গা নেই।

রবিবার সকাল সাতটাতোই আবার পয়সার হিসাব শুরু করে দিলাম! বাঙালি তো, রক্তে হিসাব-নিকাশ! মনে মনে বললাম—আজ Business নয়।

আজ একটু স্বাধীনতাটা উপভোগ করি! দেখি তো, পাশের বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে একটু উঁকি মেরে আসা যাক। সে কী করছে, একটু চমকে দিয়ে আসি! তবে আমার এই X-Ray Eyes-এর কথা বন্ধুকে একদমই বলব না! বললেই তো লজ্জায় আমার সামনে থেকে পালাবে! চলো, হাওয়া হাওয়া Man-এর প্রথম রবিবার আমজনতার অভিযান শুরু হোক!

বন্ধু চল

সকাল সকাল বন্ধুর বাড়িতে ঢুকতেই দেখি, ফোনে চাপা স্বরে কথাবার্তা চলছে। মহিলার গলা শোনা যাচ্ছে ফোনের অন্য প্রান্ত থেকে। ভাবলাম, নিশ্চয়ই গোপনে প্রেম আলোচনা করছে। সটান এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। কিন্তু দাঁড়াও... দাঁড়াও... কান দুটো খরগোশের মতো খাড়া করতেই শুনি—আরে! আমারই নাম নিচ্ছে না? ব্যাপারটা সুবিধের মনে না হওয়ায় এক কোণে চুপচাপ ওঁৎ পেতে রইলাম। ও মা! শুনে তো চোখ কপালে! আমাকে নাকি সমাজ থেকে ‘একঘরে’ করার মহাপরিকল্পনা চলছে! এ তো দেখি—প্রদীপের তলায় অন্ধকার। আরও একটু কান পাততেই দেখি—একজন-দুজন নয়, পুরো চার-পাঁচজনের একথানা শক্তিশালী মিনি-সিডিকেট ফোনের অপর প্রান্তে।

আহা রে! এরা তো আমার বন্ধু!!

আমার জন্য এত সকালে ঘুম থেকে উঠে Meeting! নিজেকে আজ বেশ VIP মনে হচ্ছে।

যাদের এতদিন বন্ধু ভেবে নিজের হাতে Spotlight দিলাম, তারাই আজ দেখছি উল্টে Limelight পেতে আমাকে সরানোর জন্য প্রস্তুত! হরি হরি! এদের তো দেখছি সেই পুরনো অভোসই আছে!—উদ্ধারকারীই আজ উদ্ধারপ্রার্থী। একটু ভয় দেখাবে নাকি? তবে একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবলাম—মিছিমিছি নিজের প্রেসার বাড়িয়ে রক্ত জল করার কোনো মানে নেই। তাই হাত জোড় করে বললাম—Not my circus, not my monkeys. দুনিয়াটা এমনিতেই গোলমাল বাঁধানো জোজোবা সার্কাস। আর সেখানে যারা লাফালাফি করছে, তারা তো অন্য কারও পোষা বাঁদরের দল! যাক গে!

কিন্তু তাদের বাড়ি ভাতে ছাই! তোরা আমাকে ধরতেই পারবি না! আমি এখন Invisible Man! এসব ফালতু নেগেটিভিটির উর্ধ্বে।

বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরোতে বেরোতে হঠাৎ একটা হিন্দি সিনেমার ডায়লগ মনে পড়ে গেল— "doston ko aazmaate jaiye, Dushman se pyaar hota jaayega"।

বাইরে বেরিয়েই এক চমক! নবোদয় সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লেখক দাদা সকাল সকাল গটগট করে বিশাল বিশাল Dumbbell ভাঁজছেন!

আমি তো জানতাম—“Pen is mightier than the sword”. কলমের খোঁচায় যারা কুপোকাত হয় না, তারা Dumbbell-এর এক ঠোঁকরেই

পটাপট কুপোকাত হতে পারে! কিন্তু ভুলে গেছিলাম-এটা ঘোর কলিযুগ!!

Amazon obhijaan না হলেও আমজনতার অভিযান—চলতেই থাকুক।

চলি, আগে বাড়ির লোকজনকে ঘুম থেকে তুলে আমার এই Super Power-এর কাহিনি শোনাই। আজ বউকেও একটু চমকে দেওয়া যাক! এতদিন মনে মনে হয়তো আমাকে বোকা, সাদা-সিঁধে, ভালো মানুষ ভেবেছে...আজ বুঝুক—স্বামী যে মাঝে মাঝে Invisible Man-ও হতে পারে।

হরিপদ একজন সাদামাটা.....

বাড়িতে ঢুকলাম। সোজা চলে গেলাম আমার শোওয়ার ঘরে। আরে বাবা! আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে বিছানায় আমার শরীরটা কে শুয়ে আছে! এক মুহূর্তের জন্য নিজের অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ হয়ে গেল! না না... এসব ভাবলে চলবে না। অনেক কাজ পড়ে আছে। আগে বাড়ির সবাইকে ঘুম থেকে তুলতে হবে, তারপর আমার এই Supernatural Power-এর কাহিনি সবাইকে শোনাতে হবে। অন্য কিছু ভেবে লাভ নেই।

ঠিক তখনই—ট্রিংইইইইং!!! একটা বিকট আওয়াজ! আমি চারদিকে তাকিয়ে বললাম—এ আবার কোথা থেকে এল? তারপর বুঝলাম—আরে বাবা আমার ফোনের Alarm বাজছে। ভাবলাম, এ তো সামান্য কাজ। আমি এখন Invisible Man! উড়ে গিয়ে ফোনটা বন্ধ করে দেব। ব্যস! তারপর—উড়লাম। আর পরের মুহূর্তেই—ধপাস!!! ব্যথায় চিৎকার করে উঠলাম—আহ্ মা গো!!!

আমার সেই চিৎকারে বাড়ির সবার ঘুম ছুটে গেল! বউ ঘুমজড়ানো চোখে ছুটে এসে বলল—কী ভীমরতি হল তোমার? এত দৌড়ঝাঁপ করছ কেন? শেষে হাত-পা ভেঙে বিছানায় পড়ে থাকবে! আমি তখন মাটিতে পড়ে কাতরাতে কাতরাতে ভাবছি—এ কী হল? আমি তো Invisible Man! আমি তো উড়তে পারি! তাহলে উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়লাম কেন? আর পড়ে গিয়ে এত ব্যথাই বা লাগছে কেন?

তাহলে কি আমার Superpower-এর Recharge শেষ? কোনওরকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উঠে ফোনের কাছে গেলাম। তারপর Alarm বন্ধ করলাম।কিন্তু হঠাৎ মাথায় আরও বড় একটা প্রশ্ন এল—আরে! আমার বউ আমাকে দেখতে পাচ্ছে। আর আমি তো উড়তেও পারছি না! তাহলে...আমি কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম?

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর নিজের মাথায় হাত দিয়ে বললাম—বাবা রে! কী ODD ভুতুড়ে স্বপ্ন!

রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা—

এমন কেন সত্যি হয় না আহা।

ঠিক যেন এক গল্প হত তবে,

শুনত যারা অবাক হত সবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই রম্য রচনার সকল চরিত্রই কাল্পনিক। কোনো জীবিত ব্যক্তি বা বর্গের সঙ্গে মিল সম্পূর্ণ কাকতালীয়!

সিনেমা ...রনিদা ...বন্ধুত্ব

ডাঃ পাঞ্চজন্য ঘটক



আমি গোটা পাঁচেক বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছি। বলার মতো তেমন কিছু নয়। ছোট থেকে ছবির জগৎ নিয়ে আমার বেশ একটা আগ্রহ ছিল। কিন্তু কোনো সুযোগ ছিল না এর ভেতরে ঢোকার। আর পাঁচটা ইচ্ছের মতো শিক্যে তুলে রেখে দিতে হয়। জয়েন্ট, ডাক্তারি, বিলেত, MRCPsych পরীক্ষা নিয়ে জীবন গড়াতে থাকে।

নরেন্দ্রপুরের বন্ধু কৌশিক গাঙ্গুলির সঙ্গে ক্লাস ফাইভ থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত চুটিয়ে নাটক করেছি। বিলেতে এসে অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না। একটা সময়ে টেলিভিশনে দেখি ওকে। আবার যোগাযোগ হলো। কৌশিক ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছিলো ছবির জগতে। কমলেশ্বরের সঙ্গে ডাক্তারি পড়তে গিয়ে বন্ধুত্ব হয়। নাটক আগেই করতো। এক সময় ছবির জগতেও দেখা গেল ওকে। ওদের কাউকে ছবিতে কাজ করার কথা বলিনি। বলাটা ঠিক হবে বলে মনে হয় নি। আর তাছাড়া বিলেতে ডাক্তারি ছেড়ে ছবিতে অভিনয় করবোই বা কি করে? বছর আটেক আগে ফেসবুকে দেখলাম একটি বাংলা ছবির শুটিং হচ্ছে লন্ডনে। এক মাঝবয়সী লোক খুঁজছেন পরিচালক। ফোন করলাম। ধরলেন Associate-Director চিত্রভানু বসু। জিজ্ঞেস করলেন - আপনার চেহারা কিরকম? আমি চিরকালই বেঁটে ও মোটা। একইরকম বেঁটে রয়ে গেছি ১৮ বছর বয়েস থেকে। আর ক্রমাগত মোটা হয়ে গেছি। বছরের পর বছর। কখনো কখনো কমে -- অল্প ভাঁটা আর বেশির ভাগটাই ওজনের জোয়ার। আমার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নিয়ে আমার স্ত্রী বৌ বা আমার কোনো অসুবিধে হয় নি কোনোদিনই। আমার Lady Friend দেও নয়। কিন্তু আমার কিছু পুরুষ বন্ধুর খুব অসুবিধে আমার চেহারার গঠন নিয়ে। কেন, কোনোদিনই বুঝিনি। আমার চেহারা সালমান খান বা হৃত্বিক রোশানের মতো হলে তাঁদের কিছু বাড়তি সুবিধে হতো কি? কে জানে!

আমি চিত্রভানুকে বললাম -- আমি বেশ বেঁটে আর মোটা। তবে জিম-টিম করি নিয়মিত। আমাকে fat and fit বলতে পারেন। হাত-পা চালানোর রোল হলেও অসুবিধে নেই। উনি বললেন --

অতটা দরকার নেই, ভারিচ্ছি চেহারা আর খানিকটা অভিনয় হলেই আমাদের দিব্যি চলে যাবে। নিন্দুকদের মুখে

আরেকবার ছাই দিয়ে বেঁটে মোটা চেহারার আমি, প্রথম সিনেমার রোল পেলাম।

এর মাস চারেক পরে আবার একটা ফোন। এবার খোদ পরিচালক জয়দীপ মুখার্জীর কাছ থেকে। জয়দীপদা জানালেন আমার মানানসই একটা রোল আছে। দিন তিনেকের শুটিং। Torquay আর লন্ডনে। ছবির নাম চালবাজ। ভালো লাগলো জয়দীপদার ফোন

পেয়ে। আমাকে বলা হলো Torquay পৌঁছে যেতে। এই ছবি নিয়ে আমি 'চালবাজ' লেখায় লিখেছি।

Torquay তে চালবাজের সেট। একটু আগে লাঞ্চব্রেক হয়েছে। হঠাৎ দেখলাম একটি অত্যন্ত চেনামুখ। আমার খুবই প্রিয় অভিনেতা রজতাভ দত্ত। একটা প্যাকিং বাক্স গোছের কিছুর ওপর বসে পরম তৃপ্তিতে ডিমের ঝোল ভাত খাচ্ছেন। প্লেটটা একটু কাত মেরে রয়েছে। আর মনসংযোগ পুরোপুরি ডিমের ঝোল দিয়ে মাখা ভাত আর ডিমের ওপর। আমার খাওয়া শেষ হতে হতে বৃষ্টি নামলো। প্রথমে টিপটিপ করে। বিলেতি কায়দায়। তারপর দেশের ফিল্ম টিমের জন্যই মনে হয় -- রীতিমতো ঝামঝামিয়ে। আমাকে বলা হলো রজতাভদার সঙ্গে একটি তাঁবুতে বসতে। কয়েকটা ছোট তাঁবু খাটানোই ছিল। তারই একটায় রজতাভদা আর আমি বসলাম। কিছুক্ষণের ভেতর বুঝতে পারলাম যে রজতাভদা একজন জিন্দাদিল মানুষ। আর রজতাভদা থেকে রনিদা হতে একদমই কোনো সময় লাগলো না। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি। আর তাঁবুর ভেতর জমে উঠেছে আমাদের আড্ডা। রনিদার সঙ্গে আড্ডা একটা আলাদা অভিজ্ঞতা। এরকম animated আড্ডা আমি দেখিনি। ওই বৃষ্টির ভেতর চা আসছিলো মাঝে মাঝেই। ঘন্টা পাঁচেক পর বৃষ্টি কমলো। একটু দম নেওয়ার জন্য মনে হয়। তখন আর শুটের সময় নেই। জয়দীপদা সেদিনের মতো প্যাক আপ বললেন। একটু খারাপ লাগলেও -- মন ভরে ছিল একজন বড়ো মনের বন্ধু পাওয়ার আনন্দে। রনিদার সঙ্গে বন্ধুত্ব আজও অটুট তো রয়েছেই, সময়ের সঙ্গে ঘন হয়েছে।

আমার দিন তিনেকের কাজ ছিল ছবিতে। ফিরে আসার সময়ে মনের ভেতর একটা টনটনে ভাব। ইউনিটের অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। একটা নতুন জগতের পর্দা খুলে যায় চোখের সামনে। টেলারিং সেকশন থেকে কেটারিং -- কি বিরাট আয়োজন লাগে একটা ছবি করতে। রনিদার আরো বেশ কিছুদিনের কাজ আছে। কথা হলো কাজ শেষ হলে লিঙ্কনে আমাদের বাড়ি আসবেন।

কথা মতো রনিদাকে নিয়ে এলাম লিঙ্কনে। অনেক কথা হলো -- ছবির জগতের অনেক মজার কথা। আবার সব কথা ঠিক যে মজার, তাও নয়। তবে সে সব গল্প লেখার জন্য নয়। অনেকেই জানেন না যে রনিদা খুব ভালো গান করেন। কুইনাইন নামের একটি ব্যান্ডও ছিল ওঁদের -- তাতে আরো কয়েকজনের সঙ্গে ছিলেন পরমব্রত, খরাজদা, যীশু সেনগুপ্ত। সেদিন বেশ কিছু গান শোনান রনিদা। গানগুলো মনে দাগ ফেলে গেছে।

রনিদা বলেছিলেন খুব বেশি কিছু রান্না না করতে। বাঙালিদের অনেক সময় খাওয়া - দাওয়ার তোড়জোড়ে অনেককিছু করা হয়ে ওঠে না। সেরকমটা চাইনি। ঘুরে দেখলাম আমাদের ছবির মতো শহর লিঙ্কন। সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়েছিলো। রনিদাকে এবার ফেরত দিয়ে আসতে হবে। প্রায় তিন ঘন্টার ড্রাইভ। গাড়িতে বসে ভাবছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডে কি গান চালাই। রনিদা বললেন ওয়েস্টার্ন কিছু বাজাও -- একটু অন্যরকম। বেশ কয়েক বছর আগে লেনার্ড কোহেনের কন্সার্ট শোনার সুযোগ হয়েছিল। জুলাই ১১, ২০০৯ সালে। দক্ষিণ ইংল্যান্ডের সারে কাউন্টির ওয়েব্রিজে। যতদূর জানি ওই কনসার্টই লেনার্ড কোহেনের ইংল্যান্ডে শেষ কনসার্ট। সেই কন্সার্টের রেকর্ডিং চালিয়ে দিলাম। কোহেন রনিদার প্রিয় গায়কদের একজন। ব্যাকগ্রাউন্ডে কোহেনের মেঘের মতো গলা, সেই অসামান্য কনসার্টের কথা, ফাঁকা মোটরওয়ে, মাঝে মাঝে দু-একটা গাড়ির হুশ করে চলে যাওয়া -- সব মিলিয়ে এক দারুণ আবেশ। রনিদাকে গন্তব্যস্থলে নামিয়ে ফিরে এলাম -- সেই আবেশ মেখে।

কলকাতায় গেলে প্রতিবার রনিদার সঙ্গে দেখা করি। বন্ধুত্ব গড়িয়েছে পারিবারিক স্তরেও। নানারকম খাওয়া দাওয়া করি - কখনো রেস্টোরাঁয়, কখনো বাড়িতে। আর চুটিয়ে আড্ডা। বছর খানেক আগে এমনই একটি আড্ডা জমে উঠেছে রনিদার বাড়িতে। রনিদা বললেন আমার জন্য আজ একটা অন্য রকম খাবার আছে। বললেন, বহরমপুরে থিয়েটার করতে গিয়েছিলেন, ওখানকার বিখ্যাত মিষ্টি ছানাবড়া নিয়ে এসেছেন। আমার ভাজা মিষ্টি খেতে খুব ভালো লাগে। ভালো ল্যাংচা, কালা জামুন, পাস্তুরা খুবই প্রিয় আমার। এই ছানাবড়ার কথা জানা ছিল, কিন্তু পরখ করা হয়নি আগে কোনোদিন। প্লেটে এসে গেলো চারটি বড়োসড়ো ছানাবড়া। টেস্ট করে দেখলাম, সত্যিই খুব ভালো। কিন্তু পেট ভরা ছিল, দুটোর পর আর কিছুতেই খেতে পারলাম না। রনিদা বললেন, তাহলে একটা টিফিন কৌটোতে দিয়ে দিই, রাতে খেও। আমি মোটা হলেও ডায়াবেটিস, হাই লিপিডস আমার নেই। তাও মনে হলো থাক, এক-দুদিনের ভেতর এতো মিষ্টি খাওয়া ঠিক নাও হতে পারে, অন্তত ওজনের জন্য। রনিদাদের বললাম -- না রনিদা, এই থাক। রনিদা আরো বার কয়েক বললেন -- এ জিনিস কিন্তু চট করে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমার জায়গায় অনড় থাকলাম। আচ্ছা থাক তাহলে, বললেন রনিদা। বাকি দুটো ছানাবড়া আবার ফেরত গেলো খাবার ঘরের দিকে।

সল্ট লেকে রনিদার বাড়ি থেকে বইমেলা প্রাঙ্গণ খুব একটা দূরে নয়। বইমেলায় অনেকের সঙ্গে দেখা করে টালিগঞ্জে আমাদের বাড়িতে ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গেলো। সেবার একাই গেছিলাম কলকাতায়। ফ্রিজে অনেক খাবার ছিল। গরম করে গুছিয়ে খাওয়া দাওয়া সারতে অনেক রাত হয়ে গেল। খাওয়ার পরে একটু মিষ্টি কিছু খেতে ইচ্ছে করলো। দেখলাম সেরকম কিছু নেই বাড়িতে। রাত অনেক হয়ে গেছে। হোম ডেলিভারির দোকানও ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে। হঠাৎ মনে হলো বিকেলের সেই ছানাবড়া দুটোর কথা। আহা, এখন যদি পাওয়া যেতো। কি সুন্দর কালচে ভাজা রসালো কলেবর। বাইরের দিকে তাকলাম -- অন্ধকারের ভেতর যেন আরো তীব্র ভাবে অনুভব করলাম ওদের রসসিক্ত অনুপস্থিতি। কোনো রকমে বিছানা নিলাম। ঘুমের ভেতর রাতভর থেকে থেকে খোঁচা মারতে থাকলো ছানাবড়া দুটো।

সকালে উঠে বুঝতে পারলাম শরীর-মন জুড়ে চেপে বসে আছে ছানাবড়া। ঘড়ি একটু গড়ালে ফোন করলাম রনিদাকে। বললাম, আজ বিকেলে কি বাড়ি থাকবে। বইমেলা তো যাবোই। তার আগে তাহলে তোমাদের বাড়ি টুঁ মারতে পারি। আড্ডা মারা যাবে। আবার তো সেই সামনের বছর। পরের সপ্তাহে তো চলেই যাচ্ছি। রনিদা বললেন, একদম চলে এসো। আর তুমি তো দুপুরে ভাত খাও না, আমাদের এখানে একটু টিফিন করে যাবে। বিকেলের একটু আগেই চলে এসো। পৌঁছে গেলাম কথা মতো। একটু আড্ডার পরেই খাবার টেবিলে বসার ডাক এলো। সাদা ধবধবে ফুলকো লুচি। সঙ্গে সোনালী ছোলার ডাল। আর তার একটু পরেই এলো সেই ছানাবড়া জোড়া। রনিদা হেসে বললেন, আমি জানতাম তোমার মিষ্টিটা খুব ভালো লেগেছে। বাকিগুলো শেষ হয়ে গেছিলো। এদুটো তোমার জন্যই রেখে দিয়েছিলাম। তুমি না এলে আমিই তোমাকে ফোন করে আসতে বলতাম।

ছানাবড়া দুটো খেতে খেতে ভাবলাম, ভালো বন্ধু বুঝবে বন্ধুর আজকের মনের কথা। আর যে খুব কাছের বন্ধু, সে বুঝবে বন্ধু শুধু আজ নয়, কাল, পরশু বা তার পরের দিন কি চায়, তার কথা ||

শেফিল্ড সে চণ্ডিগড় নু , via Marseille

সুগত সরকার

পৃথিবীটা আসলে খুব ছোট সত্যিই তাই! সেদিন কথা হচ্ছিল এক ব্যাচমেটের সঙ্গে। স্কুলের পর এই প্রথম দেখা।

কি করছি, কোথায় আছি- এর উত্তরে জানালাম, "Sheffield, নাম তো সুনা হোগা-স্টিল আর কাটলারি দিয়ে বিখ্যাত"। আশ্চর্যের ব্যাপার! সে বলল, "চিনি - তবে স্টিল দিয়ে না, আর্কিটেকচারের জন্য।" কি রকম? খোলসা হলো - Park Hill. The infamous one.

বন্ধু School of Planning and Architecture, New Delhi দেশের অন্যতম নামী ইনস্টিটিউট -এর স্নাতক। তাদের কারিকুলামে আছে এই Park Hill, একটা অগ্রগামী সোশ্যাল কনসেপ্ট হিসেবে। শুনে তো আমার মাথায় হাত! তারপর বই ঘাঁটাঘাটি; google, Wikipedia, আর একটা নতুন রকমের শ্রদ্ধা তৈরি হলো।



১৯৬০ তে নির্মিত, Park Hill ছিল যুদ্ধ-পরবর্তী হাউজিং সংকটের এক অভিনব সমাধান। স্থপতি Jack Lynn আর Ivor Smith

ছিলেন অনভিজ্ঞ, কিন্তু চেয়েছিলেন আগের দিনের terraced বাড়িগুলোর মতো প্রতিবেশীদের মধ্যে একটা কমিউনিটির স্পিরিট বজায় রাখতে। তাই তারা ডিজাইন করলেন “streets in the sky” - অর্থাৎ উপরের তলাগুলোতেই এমন চওড়া রাস্তা, যেখানে মানুষজন দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে। চারটে স্ট্রিট লেভেল, এত চওড়া যে দুধওয়ালা গাড়িও যেতে পারে। প্রতিটা লেভেল থেকে সরাসরি দোকানপাট আর pub-এ যাওয়ার রাস্তা আছে নিচে।

কিন্তু আশির দশকে এসে ধীরে ধীরে ভাঙন ধরতে শুরু করল। বেকারত্ব বাড়তে থাকল, সোশ্যাল প্রবলেমও মাথাচাড়া দিল। ড্রাগ, অপরাধ - রাতে Park Hill হয়ে উঠল এক ভয়ের জায়গা। মানুষ বলতে লাগল - জেলখানার মতন দেখতে, বিব্রী, বিপজ্জনক। Park Hill আসলে একটা জটিল অথচ ভীষণ আগ্রহ জাগানো কেস স্টাডি, পোস্ট-ওয়ার সোশ্যাল হাউজিং কেমন করে সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে তৈরি হয়েছিল, আর কিভাবে সময়ের সাথে সেই স্বপ্ন ভাঙে। এই গল্পটা দেখায় আর্কিটেকচার শুধু ইট-কংক্রিট নয়, মানুষ আর সমাজের মুখ।

এই ডিজাইন অনুপ্রাণিত ছিল Marseille-এর Unité d’Habitation, Le Corbusier-এর বিখ্যাত Brutalist মাস্টারপিস। ১৯৫২ সালে তৈরি, এক্সপোজড কংক্রিট, বোল্ড জ্যামিতিক ডিজাইন। একরকম “vertical garden city”, যেখানে একেবারে শহরের মতোই দোকান, রেস্তোরাঁ, জিম, স্কুল, সব ছিল একই বিল্ডিংয়ে। আর সেই ধারাতেই Park Hill. এখান পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু ওই যে বলে, কান টানলে মাথা আসে! Le Corbusier-এর সূত্র ধরে টান দিতেই বেরিয়ে পড়ল দেশের কানেকশন। Marseille-এর কংক্রিটের গায়ে হাত রাখতেই যেন চণ্ডিগড়ের মাটি ছুঁয়ে ফেললাম। Le Corbusier-এর কাজ post-colonial ভারতের স্থাপত্যে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

লাহোর পাকিস্তানে চলে যাওয়ার পর পাঞ্জাবের নতুন রাজধানী নির্মাণের জন্য তাকে চণ্ডিগড় পরিকল্পনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সদ্য স্বাধীন ভারত তখন নিজের আধুনিক পরিচয় নির্মাণের পথে। নেহরুর ইচ্ছা ছিল, “চণ্ডিগড় হোক ভারতের স্বাধীনতার প্রতীক, অতীতের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের প্রতি আস্থার প্রকাশ।” এই ভাবনা বাস্তব রূপ পায় Le Corbusier-এর নকশায়, যা ভারতে আধুনিক স্থাপত্যের এক অনন্য ভিত্তি গড়ে তোলে। চণ্ডিগড় ছিল ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ আধুনিক শহর, গ্রিড করা আলাদা আবাসিক সেক্টর লেআউট। যেখানে ছিল বহুপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা, আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেজ সিস্টেম, সবুজ পরিবেশ, এবং পথচারীদের জন্য

আলাদা পথ।

Le Corbusier চণ্ডীগড়ে যে স্থাপত্য তৈরি করেন, তা কঠিন জলবায়ু ও সীমিত সম্পদের মধ্যেও আধুনিক নকশার সম্ভাবনা প্রমাণ করে। ক্যাপিটল কমপ্লেক্সে প্রাকৃতিকভাবে ঠান্ডা রাখার ও বিদ্যুৎ বাঁচানোর জন্য সানস্ক্রিন, দুই স্তরের ছাদ এবং বৃষ্টির জল জমিয়ে বাতাস ঠান্ডা করার জন্য জলের পুকুর ব্যবহার করা হয়েছিল।



Le Corbusier-এর Capitol Complex, চণ্ডীগড়ে, ২০১৬ সালে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে, Park Hill এখন ইউরোপের বৃহত্তম Grade II* listed residential building-গুলোর একটি। অনুদান পেয়েছে। রেনোভেশনের সময় এক কংক্রিট ব্রিজে আবিষ্কৃত হয় একটা graffiti : "I love you ,will u marry me?" কে লিখেছিল, কাকে উদ্দেশ্য করে - আজও নিশ্চিতভাবে কেউ জানে না। তবু এই সরল, কাঁচা ভালোবাসার বার্তাটা জায়গা করে নেয় ভবনের নতুন রূপে।

এটা শুধু একটা graffiti নয়, এটা যেন এক আত্মপ্রকাশ : ভবিষ্যতের প্রতি এক প্রশ্ন, এক প্রস্তাব। "আমি তোকে ভালোবাসি - তুই কি আমাকে গ্রহণ করবি?" এই প্রশ্নটা শুধুই কোনও প্রেমিক-প্রেমিকার নয়, এটা সমাজ আর স্থাপত্যের সম্পর্কের প্রতিফলন। এই আবেদন কে নিয়ন আলোয় সেট করে দেওয়া হয়েছে, Park Hill-এর

রি-জেনারেশনের প্রতীক হিসেবে। আর সমসাময়িক world punk-pop sensation, "Doncaster -e জন্ম Yungblud-এর superhit গান 'I love you, will u marry me' র দৌলতে, ৫০ মিলিয়ন streams পার করে, এখন সেই কংক্রিট ব্রিজ, চির প্রেমের প্রতীক !

১৯৫৭- এ কাউন্সিলের নিজস্ব ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট বিতর্কিতভাবে পেয়েছিল, পার্ক হিল নির্মাণের দুই মিলিয়নের পাউন্ডের চুক্তি। যদিও বলা হয়েছিল এই নির্মাণ তাদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার বাইরে, শেষ পর্যন্ত তারা সময়মতো ,এমনকি বাজেটের থেকে কম খরচে ৯৯৫টি ফ্ল্যাট হস্তান্তর করে। Urban splash কোম্পানি দ্বারা পুনর্নবীকরণের পর Park Hill ভূসম্পত্তির ২০২৫-এ, মূল্যায়ন দাঁড়িয়ে ১৭৮ মিলিয়ন পাউন্ড।

Park Hill একসময় ছিল আশার প্রতীক। তারপর হয়ে উঠেছিল ব্যর্থতার উদাহরণ।

অথচ গল্পটা সেখানে শেষ হয়নি। আজ সে আবার নতুন সম্ভাবনার ঠিকানা। Sheffield থেকে Marseille, Marseille থেকে Chandigarh- এই যাত্রাপথ আসলে কেবল ভবনের ইতিহাস নয়; এটি স্বপ্ন, সমাজ আর সময়ের গল্প।

ওই যে বলেনা, "Life is about second chances !"



EMBROIDERY: A History of this Ancient Art: Followed by a Few Personal Reflections.

Dr Sheela Biswas

Definition of embroidery:

Embroidery is the craft of creating intricate decoration on fabric using needle and thread. The word embroidery comes from the French term “broderie” which directly translates to embellishment. This art’s history spans thousands of years and is believed to have been traced back to the ancient Chinese who may have been the first to “discover” embroidery. There are remarkably advanced samples dated between the 3rd and 5th century B.C. Embroidered clothing dating between 300–700 AD has been found in Europe, where it was used by the upper classes. Textile experts like John Gillow suggested that embroidered clothing was simply a next step from primitive sewing techniques. This art rose as a status symbol and had a prominent place in the life of nobility across the globe embroidered clothes and tapestries followed. This influence spread to the Islamic world – for example Istanbul and Damascus.



In England and the colonies young women of good social standing were trained in this craft. However, with the industrial revolution in Europe, the first embroidery machine was made in France. This craft went into mass production and available to ordinary people. This art is also now digitalised but early techniques like chain stitch is still used in this craft today.

Beetle-wings embroidery on clothing using iridescent wing cases of Buprestidae – better known as “jewel beetles”, often in combination with gold-wrapped thread, became fashionable in the 19th century. Sample housed in the Victoria & Albert Museum.

Evolution of the Indian embroidery style:

Indian embroidery was a small cottage industry – the craft passed on from one generation to the next within the family.

Ancient history:

Early examples of textile art found in the Indus Valley civilisation – Mohenjo-Daro and Harappa. This probably laid the foundation for the diverse embroidery traditions that flourish in India today. This craft was often associated with religious symbolism and used motifs from nature such as the lotus flowers, leaves and animals.

Mughal Impact

The arrival of the Mughals in the 16th century introduced styles like Zardosi (gold embroidery) used in decorative clothing. Floral and geometric patterns were introduced.

Rajputana and Deccan styles - Rajasthani embroidery work used mirror work and motifs inspired by local Flora and Fauna, reflecting the desert culture.

Punjab – “Phulkari” or “flower work”.

Kashmir – Embroidery called Khasida – often featuring the Chinar leaf peculiar to this region.

West Bengal – “Kantha” stitch began in rural Bengal using running stitch to create blankets and quilts. The designs use themes from daily life and folklore.

Lucknow – Chikan work featuring “shadow” embroidery.

Cross Stitch:

Cross stitch is an embroidery style using counted thread in which X-shaped stitches, called cross stitches, are used. The original type is “counted” cross stitch, where the stitcher counts the thread on a piece of even-weave fabric, such as linen. Cross stitch is also now done on a design stamped on fabric, called “stamped cross stitch.”

History

Cross stitch has been around globally since the Middle Ages, especially in continental Europe and Asia. In Europe, this stitch was used to decorate or initialise household linen – usually by young girls – to teach them how to stitch. In Egypt, this art can be traced back to 500 AD. This stitch spread for use in tapestries – the Bayeux Tapestry, currently in the British Museum, was one of the first to use cross stitch. It is 1,000 years old and depicts the Norman Conquest.

Embroidery in the twentieth century and beyond:

A) Men and embroidery

i) King Gustav V of Sweden and the actor Henry Fonda were amongst some men who took up embroidery as a hobby and were not ashamed to show it!

(ii) During World War II Prisoners of war turned to cross stitch as a pastime, creating pieces that sometimes-carried hidden messages.

B) Designers and embroidery

The 80’s is said to have been the “golden era” of cross stitch, with designers like Jane Greenoff founding the Cross Stitch Guild.

In India, designers like:

Manish Malhotra use embroidery in clothing, including mirror work, bead work etc.

Rohit Bahl from Kashmir uses Khasida and Ari work in his designer wear.

Some websites used:

1. advanceprintwear.co.uk

2. Vam.ac.uk

3. www.embroidica.com/post/evolution-of-indian-embroidery-style

4. [cross stitch / https://en.wikipedia.org/wiki/cross-stitch](https://en.wikipedia.org/wiki/cross-stitch)

Some Reflections

I was first introduced to embroidery as a school girl. It was a requirement there, an all-girls’ school, to pass an examination in needlework, including embroidery, at 12–13 years of age. My examination piece for presentation was a “counted” cross stitch sample, the pattern for which was taken from a Dutch embroidery book, quite common in those days.





I cherish these birds – colourful finches to this day!

My interest in embroidery continued even after this, as I was supported in this by my mother who was keen on embroidery too. I remember many a winter morning in Lucknow where I grew up, sitting in our garden with my mother, embroidering. My mother loved “satin stitch” using single strands to embroider which needed great patience.

In later years, among many other stitches, I was introduced to “stamped” cross stitch which is not as time consuming as the “counted” one.



Interestingly enough, after my marriage, I found that my mother-in-law was very much into embroidery too, and an example follows. This is called “corded floral embroidery” and gives a 3D effect – rather sophisticated!

Embroidery for me, in later years, fell by the wayside. However, I picked it up again last year when I was given a “modern” embroidery pack by my sister-in-law. This was a “beginners” pack, but I still found it complicated. This shows what lack of practice can do.



In this piece common stitches are used – “basket stitch” for the basket, “chain stitch” for the handle, “satin stitch” for the petals and “French knot” for the flower centre.

These are stitches that have been used for generations and it is heartening to see that they still survive.

In conclusion, in my opinion, embroidery teaches us that though life is ever evolving, the basis of this ancient art has certainly stood the test of time.



Diary of a not-so-Wimpy Durga Pujo Fashionista

Sharmistha Bal

January 1st -

New Year celebrations are over, so now it's time to start selecting sarees for Durga Pujo.

January 31st- Whole month gone already, and I did nothing, so I set an reminder in calendar for February - **START SELECTING SAREES** (in bold font, and capital letters, as I need to tell myself off for not sticking to my own agenda, but then, it is only January; I have many months to go).

February 1st- I ordered a beautiful red and white saree for Ashtami online, posted at Ma's address, and then requested a friend to collect it from Ma when she goes to India.

February 28th- I got the saree, my friend got it for me, she collected it off Ma. However, I didn't like the fabric, so I requested another friend who was going to Kolkata to return it to Ma, who posted it back to the vendor. February gone; another month got wasted with no saree in my wardrobe. I need to have a more fruitful March.

End result, saree score is 0.

March 5th-

I have got nothing; nothing at all. My friends would have had all blouses stitched by now, and I have no new saree; none at all. I know I have a wardrobe full of sarees, but that's not the same. For Pujo I need (not want; need, need to emphasize the word in my head) sarees, and I have none.

March 27th- saree score-1

Went to an event, brought a beautiful handloom saree. What a work of art, what a fantastic blend of colours; I will rock the Pujo with this saree. However, the saree is yellow, I should save it back for Saraswati Pujo.

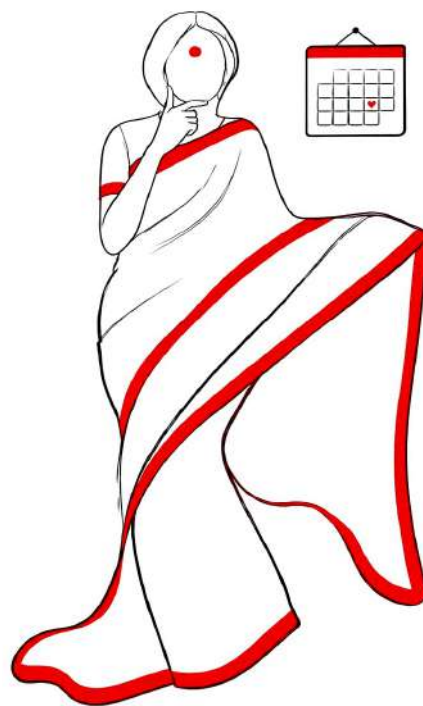
Durga Pujo saree score- 0 again.

April 1st- Went to a local fabric shop, saw 6 meters of raw silk dress material at half price. The colour was awful. It was a strange mix of beige with mud and charcoal. Obviously, I consider myself talented enough to do all-over embroidery and make this a unique saree, and I have five months to go, so I bought it without further ado.

Saree score- 0.5 (I have the saree, but it is not ready to wear).

So much to do, so little time.

April 15th- I met friends for Poila Boishakh; all were in beautiful sarees, and that reminded me that I need to buy my sarees and sort them, accessorise them, fall-pico them- and my list in my head goes on and on. How much pressure can I handle? It is too much for my poor brain.



May and June- It is exam time for kids (I am, as usual, more stressed than them), so I have no time to think of sarees, as I have other tension instigators increasing my cortisol levels.

July- Chalo Kolkata- We decided to go to Kolkata. We went to just couple of saree shops with my parents, and got all saree shopping done, not only for Durga Pujo, but also all other Devi Pujo

sarees are sorted. All I now need to do now, is to make sure I have accessories and sandals. That is all, nothing else to worry about for now.

Saree score- loads + 0.5 (I will start the embroidery soon, for reference, please see the diary entry in April).

August and September-

I have time

I can think about each saree, think of accessories.

I can make it work, and look nice.

October 1st-

I don't have time.

I can't think of each individual saree; I don't have many accessories

I can't make it work; I will end up looking horrible.

Panchami-

I will just put all sarees in one big suitcase so I know what to wear, and if I don't have blouses, I will make black or gold work. If I don't have any accessories, I will wear a simple gold chain and pendant, which would be a convenient and easy choice. If I don't have any sandals, I will wear Sketchers, no one will be able to see under the saree, and it is good for my feet's health.

Ashtami morning

I am unable to find a proper petticoat; I fretted about sarees but forgot about petticoats. What do I do? On top of that, the matching clutch which I am supposed to clutch on to for the whole evening does not even clutch inside it my phone and wallet, let alone my makeup. I ended up with an unplanned saree with a big bag which has EVERYTHING.

Dashami-

After five fun-filled days, we had our Sindoor khela, and I feel I looked happy if not good. Our Pujo was fun and festive. To be honest, I don't care how I looked, I care about how I felt, and I felt wonderful after such lovely days of Pujo with family and friends. Wish my parents were here in the UK with me instead of Kolkata; they would have had such a fun time with all of us.

End result

Saree score - Who cares!

Fun score- infinite, and more to come next year!!!!!!

Ashchey bochor abaar hobey, Joy Ma.....

আপনজন

মনীষা রায়

আমার নাম সময়। যুগ যুগ ধরে কতো শত গল্প আমার চোখের সামনে লেখা হয়েছে, তোমাদের সেইসব গল্প বলতে গেলে আরও অনেক যুগ কেটে যাবে। আজ বলবো একটা সুন্দর সংসারের গল্প। যে সংসারটাকে আমি আমার চোখের সামনে পরিবার হয়ে উঠতে দেখেছি। পরিবার কথাটা শুনতে বা বলতে আমার খুব ভালো লাগে। কেমন যেন একটা শিহরণ বয়ে যায় আমার সমস্ত শরীর ও মনে।

পাড়াটির নাম সুখপল্লী। অবশ্য এই নামটা আমারই দেওয়া! কিছু একটা নাম ছিল বোধহয়, এখন আর আমার মনে পড়ছেনা! আসলে ঈশ্বরে বিশ্বাসী মানুষগুলো একজোট হয়ে হাসিমুখে সব দুঃখকে জয় করে, খুশি আর আনন্দে ভরিয়ে রাখে সবাই সবার মন। তাই এমন নাম ছাড়া অন্য কোনো নাম আমার মনেই এলো না। আমি ঠিক বুঝতে পারছি, তোমরা ভাবছো সময়ের আবার মন কি করে থাকবে? আমিও তাই ভাবতাম, কিন্তু তোমাদের সাথে থাকতে থাকতে আমার মধ্যেও একটা মনের জন্ম হয়েছে!

যাই হোক, আমি যে সংসারের কথা বলছি, তাঁরা সেই পাড়ার গণ্যমান্য লোক তো বটেই, তার ওপর আবার আলাদা করে সবার মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন সেই বাড়ির গিন্নিমা। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এই বাড়ির বড়ো লোহার গেটের সৌন্দর্য্যও দেখার মতন! গেটের উপরে খুব সুন্দর কারুকার্য করে বানানো আছে সিমেন্টের ঢালাই করা অর্ধেক চাঁদের আকার। যাকে ভর করে নিশ্চিন্তে আশ্রয় নিয়েছে দু রঙের দুটো কাগজ ফুলের গাছ। গেট পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে পা দিলেই মনটা ভরে ওঠে, নানা রঙের প্রজাপতি, পাখি, রংবেরঙের ফড়িং যারা অপেক্ষা করছে সবাইকে স্বাগত জানানো বলে! তার ওপর উপরি পাওনা, গিন্নিমার স্নেহমাখা হাসি! অনেকখানি জায়গা জুড়ে ফুল, ফল আর সবজি দিয়ে সাজানো বাড়িখানা সবার নজর কাড়ে! এ পাড়াটি, আর পাঁচটা পাড়ার চাইতে বেশ খানিকটা অন্যরকম! এখানে শহরের মতো কলিং বেল বাজিয়ে কেউ কাউকে ডাকেনা। সবাই হাক-ডাক করে, হৈ-হুল্লোড় করে এমনভাবে মিলে মিশে থাকে, দেখে মনে হয় যেন সবসময় উৎসব লেগেই আছে। আর গিন্নিমা হলেন সব উৎসবের মধ্যমণি।

গিন্নিমার ছিল এক ফুটফুটে রাজপুত্র। রাজপুত্র বলছি, কেনোনা হালকা ছিপছিপে চেহারার টুকটুকে ফর্সা ছেলেটি, তার ডাগর ডাগর চোখের চাহনিতে সবার মন জয় করে নিয়েছিল সেই ছোটবেলা থেকেই। আসলে গিন্নিমা পাড়ার প্রত্যেকটা মানুষের মনকে, স্নেহের জাদুকাঠি ছুঁয়ে, খাঁটি সোনার মতো করে দিয়েছিলেন। গিন্নিমার নজর এড়িয়ে পাড়ার কোনো ছেলেমেয়েরা কখনো না খেয়ে স্কুল যেতে পারত না। তাঁকে খুশি করার জন্য, ছোটো ছেলেমেয়েরা অপেক্ষা করতো, কখনো কোনরকম ছোটো কাজের জন্য যদি ডাক পড়ে! যেমন, উঁচু ডালের ফুল পাড়া, গাছ থেকে বাতাবী লেবু পেড়ে সবার বাড়িতে দিয়ে আসা, ছুটে গিয়ে সামনের দোকান থেকে কিছু নিয়ে আসা

এভাবেই খুশি-আনন্দে কেটে গেল বেশ কয়েক বছর। গিন্নিমার রাজপুত্র ছেলেবেলা কাটিয়ে কৈশোরে পা রেখেছে ঠিকই, কিন্তু তার মন - মানসিকতায় ছেলেবেলার আবেগের ছোঁয়া এখনও রয়ে গেছে। নিজের সমবয়সীদের চাইতে ছোটো ছোটো কচি - কাঁচাদের সাথে সময় কাটাতে সে বেশি পছন্দ করতো! পড়াশোনা আর খেলাধুলায় তার জুড়ি মেলা ভার! সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল, কিন্তু সেই দিনটার কথা আমি আজও ভুলতে পারিনা! সকাল থেকে একবারের জন্যও কেউ গিন্নিমাকে দেখেনি! সবাই লোহার পাত বসানো গেটের বাইরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো, এক ঝলক রাজপুত্রকে দেখার জন্য! দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল হলো, গিন্নিমার বাড়ির গেট খুলে গেলো। বাড়ির মধ্যে যাবার অনুমতি পাবার অপেক্ষা না করেই সবাই প্রায় আছড়ে পড়লো গিন্নিমার সামনে! গিন্নিমা তাঁর স্নেহজড়ানো নরম স্বরে বললেন, “তোমাদের অনুমতি পেলে, তোমাদের রাজপুত্রকে উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে নিয়ে যেতে চাই!”

Contrasts in Life: From Chicago to Santiniketan

Shreyas Samanta



Imagine replacing bustling streets and towering skyscrapers with red-earth paths and greenery. This was the contrast I experienced during my summer holidays, travelling from Chicago to Santiniketan within just a few weeks. Although each destination offered a fascinating and memorable experience, what stood out most to me were the striking social, economic, environmental and cultural differences between these places.

One of the first contrasts I noticed was the way people lived their day-to-day lives. In Chicago, I witnessed a fast-paced urban lifestyle: a banker rushing to get his third coffee of the morning, a tour guide attempting to navigate his group of eager tourists and a woman playing guitar on the streets, hoping to receive donations. In Santiniketan, however, the atmosphere felt very different. I saw rickshaw drivers approaching passers-by to offer them rides, dozens of street markets selling an array of goods and people going about their daily routines at a much slower pace. These observations made me realise how Chicago's global influence creates a culture of speed and specialisation, whereas Santiniketan's smaller population and scale create a different form of crowdedness, characterised by more face-to-face and informal interactions. During our stay, we even began to recognise the same rickshaw drivers, giving our interactions a more personal feel.

The economic contrast was equally apparent. In Chicago, we strolled through streets surrounded by enormous stone and glass towers, looking up at recognisable names such as Bank of America and Google. As a major financial and commercial hub, Chicago attracts multinational corporations, hotels and other businesses, generating significant employment and economic activity. The highly specialised jobs I encountered demonstrated the division of labour within a large urban economy. In contrast, along the earthy paths of Santiniketan, street vendors, rickshaw drivers and craftspeople were far more visible. Economic activity appeared to be centred around smaller-scale, locally operated businesses, giving me a very different perspective on how income is generated.



Perhaps the most memorable economic difference was how prices were determined. In the markets we visited in Santiniketan, we could bargain with sellers and negotiate a lower price, whereas prices in the shops and restaurants we visited in Chicago were generally fixed. At first, this seemed like a simple

cultural difference, but later it made me wonder, why is this the reason?. Of course, there is an explanation. Many market stalls were privately owned by individual sellers, who could choose to accept a lower profit margin if it meant securing a sale. Prices could therefore be influenced by negotiation, demand and competition. In contrast, larger businesses generally used fixed prices, allowing them to maintain consistency across many customers and transactions. This made me realise that economic concepts such as prices, competition and profit are not simply theories, but forces that shape everyday experiences.

The environmental contrast was perhaps the most visually obvious. Santiniketan is characterised by low-density development surrounded by dense greenery, contrasting sharply with Chicago's densely built urban centre. In the Windy City, greenery is more concentrated in trees lining the streets and public parks situated between offices and shopping centres, whereas vegetation appears more naturally throughout Santiniketan. However, I do not believe environmental quality should be judged solely by the amount of greenery. Litter was more prominent along the streets of Santiniketan than in the areas of Chicago we visited, which may partly reflect differences in waste management. Although Santiniketan has a much greener natural environment, Chicago appeared to manage visible waste more effectively.

Culture offered perhaps the most meaningful contrast. At the Tagore Museum in Santiniketan, I learnt about Rabindranath Tagore and his immense influence on Bengali literature, education and the arts. Before visiting, I knew Tagore primarily as a famous writer, but learning about his ideas and his role in developing Santiniketan gave me a much greater appreciation of his importance to the region. Chicago, however, expressed its culture through a very different medium: architecture. During the Chicago River architecture boat tour, I learnt how different architectural movements and periods had shaped the city's identity. While Santiniketan's culture felt deeply rooted in history and heritage, Chicago's was expressed through its built environment and the diverse influences that have shaped the city.

Ultimately, travelling between these contrasting places showed me that no single aspect can define a region. The way people interact, earn an income, use their environment and express their culture is shaped by the history and circumstances of the place around them. Chicago's scale and global influence created a fast-paced, highly specialised and densely developed environment, while Santiniketan offered a slower pace of life, smaller-scale economic activity, abundant natural greenery and a strong connection to Bengali heritage. Experiencing both made me appreciate that travelling is not simply about seeing new places; it is about understanding why they are different and how the people who live there have shaped them.



A Day in Stratford-upon-Avon

Somrik Ghoshal

It was the summer holidays, and we set off on a journey to immerse ourselves in the history of Shakespeare and his family. Although I was very sleepy, I was extremely excited to begin our Shakespearean journey in the morning. We started at 8:45, but our journey was delayed because Dad forgot our picnic lunch. However, once we had collected it, we set off again at 9:15. The road trip was very mundane and long. Time crawled by as slowly as a slug.

Eventually, the long, boring journey came to an end. We arrived at Anne Hathaway's house. As soon as we stepped into the house, I was astonished by the garden. It was bursting with vibrant and colourful plants and flowers. The flowers seemed to dance in the breeze and whisper the love story of Shakespeare and Anne Hathaway. The cottage itself was enormous, with uneven bricks, a thatched roof and dark wooden beams. The top floor was very old and made a creepy, creaky sound as we walked across the wooden planks. The visibility was quite poor due to the dim lighting, which made the atmosphere feel eerie. The steep steps made me wonder how Anne used to run up and down on them. The white walls and black beams of the house gave it the feel of ancient black-and-white photographs, creating a sense of travelling back in time.

Next, we saw a statue of Shakespeare. We took a couple of pictures and stepped into Shakespeare's house. The house was very exciting for me. I felt like Shakespeare was standing right in front of me. It was more than colossal. The upstairs did not feel as hazardous as Anne's house. I loved Shakespeare's house most because of his bedroom, especially his bed, which reminded me of Mama's house in Balir More, Kolkata. We all saw how low the building was and how hard it would have been to live there. It had steep steps. The design was simple and old, with an uneven ceiling. It had black-and-white walls with rough plaster and lots of vibrant paintings and wallpaper. The ceiling was covered with dark timber beams, and the floors were worn.

Surprisingly, in the garden we also saw a statue of Rabindranath Tagore.

Our teacher teaches us about Shakespeare, and even in the playground, he is with us through jokes.

Please let me share some that we chant in the playground.

What is Shakespeare's favourite weapon? **A spear.**

What is Shakespeare's favourite fruit? **A pear.**

What is Shakespeare's favourite drink? **A milkshake.**

Where is Shakespeare's favourite place to relax?

The balcony, because of the balcony scene in Romeo and Juliet.

What is Shakespeare's favourite sandwich? **A Ham-let sandwich.**

What is Shakespeare's favourite night? **Twelfth Night.**

Why does Shakespeare only use a pen?

Because he cannot decide whether to use "2B" or "not 2B".

I will never forget this unforgettable adventure.



A trip to South Wales

Prangshu Mandal

On Saturday the 18th of July, my family and I travelled to South Wales for my birthday. As we travelled, we saw fabulous views and roads that felt like slides. When we arrived at our first destination, Henrhyd Falls, we were quite disappointed, as unfortunately most of the water had dried up and there was only a very small stream of water left. Fortunately, our next destination had a waterfall in it which hadn't dried up. Excitedly, we travelled there by car so we can reach quicker and this time, we were not at all disappointed. The waterfall was amazing. We could go to the other side by jumping across? going across the rocks and take fantastic pictures.



Afterwards we went to Rhossili bay beach, which was extremely windy, but I loved it as it was boiling that day. It was the best feeling ever. We took so many photos that I can't count them all. As for the view, it was outstanding, I had never seen a beach this big in my life.

After we took all the pictures, we were so exhausted that my mum was too tired to drive, so my dad had to drive all the way to the hotel in Pembroke. As soon as we entered the hotel, my parents wanted to sleep as it was 9pm and my parents usually sleep at 8:30pm. When I had changed into my sleeping clothes, I wasn't feeling tired at all as I wasn't the one drove the car, so I played on my Nintendo until it was 10pm when my eyes started to hurt. I put my Nintendo away and instantly fell asleep.

Sunday the 19th of July

When we woke up the next morning, we got dressed and went out to have breakfast somewhere. Thankfully, we found a nice place to eat called Laws Street Diner. After we finished our breakfast, which was delicious, we (headed towards or started our journey?) to our first destination of the day called Elegug Stacks. When we arrived, I excitedly ran out and went on to the grass. After a few minutes, I was drained, so I sat on the grass for a bit. Then my parents called me, but for some reason I went through the spiky bushes, and my leg was covered in cuts. Afterwards we travelled to the Green Bridge of Wales, which was majestic, I was confused. There were no bridges or something to cross over, but as I turned my head I realised there were many small arches. Among these there was one massive arch that you could go



over and that was the bridge. Unfortunately, we were too tired to walk that far so we didn't get the picture of the arch. Even though I said that most of the arches were small, in real life, they were quite big and the sea felt like it didn't end. Our next stop was Bosherton Lily Ponds, but it was too late to go there. So, we went to a beach called Broad Haven South Beach. As we arrived at the beach, my mum spotted a sign that said you must walk 30mins to get to the beach. When my mum saw that sign, she instantly suggested that we go to the top and not down and we agreed

because it was a long way down. When we arrived at the top, my mum was so exhausted that she nearly fainted. So, we took a small break and went back, which was significantly easier since it was downhill.

After this, we went to our next destination. As we arrived at Saint Govan's Chapel, we could not find the old chapel anywhere at all. We all gave up on finding the chapel, so my dad took around 200 photos and made his phone so hot that he couldn't touch the phone anymore. When we're heading back to our car, my mum noticed a map and saw that we had to go down to see the chapel. So, my family and I went down to the chapel to notice that there was only a single room left in the broken chapel which we kind of had expected. So, we went down over the rocks towards the arch we found at the very bottom, and getting there was very difficult.



As we started to go up, I asked, "Where is our next destination?" My mum said that we are going back to the hotel as all of us were drained. As we were driving back home, me and my mum were starving so we went to KFC, but the flavour was terrible there compared to the one next to my house, but the fries were good. When we arrived at the hotel, I got changed and went on with my Nintendo for a while as my dad was watching the football World cup final, Argentina versus Spain. When my dad finished watching the final, I had already put my Nintendo away and was fast asleep. The next day, we were going to an island called Caldey island. We parked our car and walked to the docks where our boat was waiting. When I got



on, I was super excited as I hadn't been on a boat in 4 years. As we set off, the view was amazing and the wind felt nice.

It was a short journey, but it was good. When we arrived on the banks, we got off the boat and started to walk all around the island. First, we went to a little ice cream shop as it was hot that day and then we went to a big and quite chapel and lit a candle. On the way to the chapel, we saw a lot of big houses, which were very colourful. We went to the chocolate factory, but I couldn't go in because there was too much chocolate smell. So, my mum and I went to the lighthouse, which was windy. Afterwards, we noticed that it was time to go back. So, we went on the boat to go back to the hotel. When we went to hotel, we had pizza and went off to bed.

Last Day

When we woke up, I remembered that it was the last day of my birthday trip, so we got dressed and my mum started to pack our things to check out of our hotel. When we put our bags in the car, we took more pictures next to the castle and then ate breakfast and started our journey back home.

Senior Summer Cup, 2025 Waterton Park Golf Club

How did you do?

Anil Kumar Mandal

We moved from The Park in Nottingham to our new house in Sandal in 1977, bordering Wakefield Golf Course on a leasehold property owned by the Pilkington family, who were living in South Africa. There is a public footpath and trees separating us from the green and the third tee. This is the only course in this area, the oldest and very popular locally. I had heard that their members were snobbish and arrogant. I became captivated by these open wild fields, carefully maintained, adjoining the back garden. I knew nothing about golf, nor had any interest. During winter, when it was covered with snow, I went there during Christmas for sledging with Jayanta and Sudeb.

The golf course had been there long before this small estate was built. We picked up golf balls from our garden with a bit of thrill and apprehension. Some golfers occasionally broke our kitchen window and greenhouse glass. There have always been risks to the windows, being near the golf course. We moved the greenhouse a bit out of the way, but that did not help.

I kept a couple of beehives in the garden and harvested 42 pounds of local honey in the first year. Contrary to my belief, local honey did not relieve my hay fever. The bees increased in number and one day they swarmed, risking public health. I learned about beekeeping but gave away three hives to another local beekeeper.

When I saw golfers playing in windy, wet, cold weather with umbrellas, I felt pity for them and thought it was some sort of madness.

With time, golf began to become more popular. I changed too and decided to join the crowd. I learned that the waiting time for membership was as long as ten years.

I was offered membership at Silkstone Golf Club but I had to play under supervision. I rejected that offer imprudently. But they were right. With balls and golf sticks and without any experience I would have been dangerous to others and to the ground. Moreover I had no time then working 8am to 9pm, seven days in a week. I gave up my ambition of becoming a golfer.

In late nineteenth demand for golf soared. Building of golf courses were very profitable business. In a nearby Woolley village a farmer turned his fertile farming land into a golf course. At the same time group of golf enthusiasts bought the wheat field within a magnificent 19th century country park estate at Walton village at a cost of a million pounds and planned a private ownership championship golf course. Great idea, we all joined. I was shown in ride on a Land Rover all the activities. I was convinced and bought



shares in September 1994 along with many of my medical colleagues paying £6000 per share/debenture.

I became one of those 650 ownership members of The Waterton Park Golf Club, a Championship course over 200 acres of rolling countryside surrounding the lake of Walton and streams, forest and nature reserve. Moreover we have also huge practice ground, clubhouse and orchard and halfway house.

I was then member and share holder. During that time I was not a playing member, neither had time nor compelling in golf, not paying membership fees and expecting high return of this great investment in future.

In 2003, the Waterton Park Golf Club was taken over by Administrator because of bad debt. We all lost our money. There was no doubt at the time that land, course, driving range clubhouse all would have been bought by someone else outsider at a very cheap price.

Rescue Committee was formed. With their great efforts and further generous contributions from us we bought our club back.

"New Waterton Park Limited" now owned all land and building. Waterton park Golf Club is their tenant and running the show as a good tenant since 4th. September 2003.

The year 2004 was the time I became new share holder again, a playing member and took interest to understand golf and started to play golf off and on. Like many of my colleagues, I found to train my body, such as stance, swing, rotation of shoulder, keeping the head down fixing the eyes on ball and timing etc. were very difficult.

I collected few good books on golf and took some lessons from professional. I tried to play in a group and competitions, felt bit embarrassing but noticed others facing some difficulties and trying to get better. In the mean time I noticed some of my medical colleagues sold their shares and quietly disappeared. It was difficult to get a good playing partner some one better to play together. Even though golf is an individual game completing to self-adhering etiquette and attire and very sociable.

I joined Rabbits group. Members in this group were playing off with high handicaps, but majority were very good. I felt some inhibition for me to join conversations with them, in their local colloquial dialect. I got the opportunity to play at many other clubs in a reciprocal arrangement. Each golf course is beautiful but different because of land topography and layouts with hidden risks and challenges. Local knowledges are therefore very helpful. Assessment of the course before playing is important. In a team of four balls, two are from home and two from visiting club played friendly competitive game finishing mostly in draw followed by drink and dinner.

In a club I noticed that seniors are the backbones and younger like Tiger group are the future. In Waterton golf club, Senior group is bigger, organised and plays three week days in early morning. Many played off at single figure handicap.. On arrival at 8 am we all gathered for Roll up, balls were drawn up at random, teams were formed, prize money collected and teed off to start for a full round of Stableford competition. Before the club house is opened at 8am, we all are there.

One such a morning I faced an unexpected incident. A grumpy old man was in charge of team selection. As soon as I put in the ball, he returned back the ball, reacted erratically in presence of

over twenty members and said I returned the ball because my handicap was not up to date. Although he later apologised. I played fairly regularly, found it a difficult game and I did not improve as I expected. In this way I was playing better and enjoying more.

One is allowed to take 14 clubs in his bag. Judging the right club in location, spot and distance from the pin is key to the success. To me my bag is too heavy and confusing to pick up the correct one from so many. For me eight clubs are enough. Correct reading of the green is difficult and single most important deciding factor of winning or losing.

I am not a long hitter but pretty accurate and straight. In good playing condition I can achieve 150 yads bang on the middle of the fairway. I concentrate on my short games like chipping and putting where strength is not that important. I hardly loose any ball avoiding penalty stokes

In summer I played for senior summer cup (Mike O'Donnell Trophy) competition as previous years. Mike is a nice person, of same age, founder member, was club president for three consecutive years. Mike sponsored this tournament. He expect me playing in his sponsored game. In every year I was within first six to eight.

This is Stapleford competition, six best scores out of 12 rounds are counted and on an average fifty players take part. In my first round this year in 2025, I was in third position. Looking at the score board and knowing the persons playing their age and handicap I decided to take the challenge seriously. In this year's summer, dry light air, hard ground, mild wind and straight hit in the middle of fairway along with improved chipping and consistency in putting I was confident. In second round my position was number one. I knew if weather changed I would had been in trouble. I played first six rounds, played well in all and maintained my number one position, well ahead of next runners up in points. I could afford not playing in bad weather, waited and watched.

In my last round, while I was waiting with my three partners (one of them was my marker) for teeing off at number I tee, a member and closed competitor walked towards me from half way house. He sarcastically remarked, instead of congratulating within earshot of my marker and two other playing partners, "Anil, are you counting right?" I realised he wanted to upset me and spoiled my round and undermining the credibility to my markers. I remained quiet and smiled wishing him to play better, reminding six more round to play. I said these to my waiting partners and concentrated to get on with my play. After my final sixth round I won by total 9 points ahead of runner up.

I circulated my story in writing to all senior members without mentioning the name. I got large response condemning this behaviour. One suggested naming and shaming this person.

On the way to club house on presentation day I met the same person in the corridor. He said "Anil, is it me or some one else made you to write" I paused for few seconds and said no one else, it is you".

He said "I am sorry it was just a joke. I did not realised you would have taken so seriously. I apologised."

I am grateful to Noel Picking and James Hughes for marking my score cards and Harry Robinson for being observer and admirer.

Thank to Mike O'Donnell for sponsoring the Senior Summer Cup.



স্বর্ণযুগ (?) এর গান

সৌম্য শঙ্কর বসু

পুজোর সময়, শুধু পুজোর সময়েই বা বলি কেন, সব সময়েই উত্তম - সৌমিত্র, মোহনবাগান - ইস্টবেঙ্গল, হেমন্ত - মাম্মা র মতো বাঙালির আর একটা প্রিয় বিষয় স্বর্ণযুগের গান। পত্র পত্রিকা, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের পুজোর অনুষ্ঠান, সব জায়গাতেই শোনা যায় স্বর্ণযুগের মতো গান এখন আর হয়না, তখন নাকি সব গানই সুপারহিট হতো।

কোভিড এর সময় অনলাইনে গান শোনা যখন বেড়ে গেছিলো, তখন বেশ কিছু সমকালীন গান শোনার আগে পর্যন্ত আমিও সেই ধারণার ই সমর্থক ছিলাম। যদিও এখনো মনে মনে স্বর্ণযুগের গান ই গুনগুন করি, এখনকার গান ভালো হয় না আগেই সব ভালো গান হতো সেটা এখন আর বিশ্বাস করিনা। স্বর্ণযুগের সব গানই সুপার হিট, সেটা যাঁরা বলেন তাঁরাও জানেন সেটাতে একটু অতিশয়োক্তি আছে, কারণ সেটা সম্ভব নয়। আবার এটাও ঘটনা, ৪৯/৫০ থেকে সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তৈরী গান নিয়ে আলোচনা শুরু করলে যে ভাবে আলোচনা এগিয়ে চলে, সমকালীন গান যতই ভালো লাগুক, দু একটা কথার পর সে আলোচনাটা থেমে যায়।

ব্যাপারটা যদি এতটাই সহজ হতো তাহলে নির্দিধায় বলে দেওয়া যেতো, সেই সময়টার এমন একটা কিছু ম্যাজিক ছিল যেটা আর পরে আসেনি। কিন্তু ঘটনা সেটা নয়। ৯২ সালে 'তোমাকে চাই' আর ৯৩ সালে 'এই বেশ ভালো আছি' বেরোনোর পরে কিন্তু প্রায় বছর দশ পনেরো বেশ কিছু সমকালীন গান এবং বাংলা ব্যাদ এর গান একই রকম হিট হয়েছিলো, এবং সেগুলো নিয়েও একটা প্রজন্ম আলোচনা করে। যদিও ওই সময়টাকে স্বর্ণযুগ এর আওতায় ফেলা হয়না।

এখানে স্বর্ণযুগ নিয়ে আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত ভাবনা লেখার চেষ্টা করছি। এটা কোনো তথ্যপঞ্জিকা বা ঐতিহাসিক দলিল ও নয়। কয়েকটা নাম হয়তো আসবে, তবে সেগুলো শুধুই উদাহরণ।

রেকর্ডের প্রযুক্তির পরিবর্তন, স্বর্ণযুগের অবসানের একটা বড় কারণ। ষাটের দশকের শেষের দিক পর্যন্ত ৭৮ আরপিএম এর গ্রামাফোন রেকর্ড তৈরী হতো। ৪৫ (ই পি) বা ৩৩ (এল পি) আরপিএম রেকর্ডের প্রযুক্তি তার অনেক আগে এসে গেলেও সেগুলো চালাতে ইলেকট্রিক রেকর্ড প্লেয়ার লাগতো। ষাটের দশক পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গাতেই ইলেকট্রিসিটি ছিলোনা বলে প্রযুক্তি থাকলেও ৭৮ আরপিএম রেকর্ডই তৈরী হতো।

গ্রামাফোন রেকর্ডে একজন শিল্পীর দুটো গান থাকতো। সেখানে ই পি রেকর্ডে লাগে চারটে গান, এল পি রেকর্ডে আট থেকে বারোটা। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একজন শিল্পীর গলার সঙ্গে মানানসই দুটো গান তৈরী করার থেকে কাজটা অনেক কঠিন হয়ে গেলো। পরিমান আর গুণমানের চিরাচরিত সমস্যা দেখা গেলো। অনেক সফল জুটি ই আর বাণিজ্যিক সফলতা পেলোনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সলিল চৌধুরী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় জুটি। গ্রামাফোন রেকর্ডের অন্যতম বাণিজ্য সফল জুটি ১৯৮০ সালে 'অনেক গানের পাখি' বলে এল পি রেকর্ড করেছিলেন, সেটার কথা কতজনের মনে আছে জানিনা।

অবশ্য তার মানে যে কোনো গান ই বাণিজ্য সফল হয়নি ইপি, এলপি আসার পর, সেটা নয়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে কিশোরকুমার এর বেশ কিছু গান (আমার পূজার ফুল ইত্যাদি), সুপর্ণকান্তি ঘোষের সুরে মাম্মা দে র কিছু গান (কফি হাউস) বাণিজ্য সফল হয়েছে।

তবে গ্রামাফোন রেকর্ড প্রকাশ বন্ধ হওয়ার পর বাণিজ্য সফল আধুনিক গানের সংখ্যা যে কমে যায় সেটা সত্যি। সত্তরের দশক থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল গীতি, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তের গান এর এল পি রেকর্ড প্রকাশ অনেক বৃদ্ধি পায়। সেগুলো বাণিজ্য সফল ও হয়। কিছু 'চমক' দেওয়ার ও চেষ্টা করে রেকর্ড কোম্পানি, যেমন আশা ভোঁসলের রবীন্দ্রসংগীত এর এলপি, মহম্মদ রফির নজরুলগীতির এলপি এবং বাণিজ্যিক সফলতা পায়। কিছু গবেষণামূলক রেকর্ড ও আসতে থাকে, যেমন 'দেশবন্ধুর গান', 'রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গান' ইত্যাদি। এই পরিবর্তনের কারণ টা পুরোটাই বাণিজ্যিক।

ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে সত্তর দশকের শেষ অর্দি বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতাও (নকশাল আন্দোলন, বাংলাদেশের যুদ্ধ, জরুরি অবস্থা ইত্যাদি) মানুষের জীবনযাত্রায় অনেক পরিবর্তন আনে। মানুষের মানসিকতার ও পরিবর্তন হয়। সেটার প্রভাব ও গানের পছন্দের ওপর নিশ্চিত ভাবেই এসেছিলো। সেই পরিবর্তনটা বুঝতে শিল্পীদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

পুরোনো গান গুলো মানুষের চেনা ছিল, তাই সেগুলো তাঁরা শুনতেন। সেই কারণে আশির দশকে রিমেক (বা আজকের ভাষায় কভার) গানের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছিলো। প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ শিল্পী দের ও নতুন গানের বদলে পূর্বপ্রকাশিত গানের সংকলন বেশি প্রকাশ হতে থাকে। এই সময়েই ক্যাসেট ও সিডি র রমরমা শুরু হয়। প্রাথমিক ভাবে সেটা বাণিজ্যিকভাবে ভালোই হয়েছিল, কারণ ক্যাসেট সহজলভ্য এবং রেকর্ডের তুলনায় সস্তা হওয়ায় অনেক মানুষের হাতে অনেক সহজে পৌঁছতো।

রিমেক এর রমরমা সময় থেকেই সম্ভবত ৫০ থেকে সত্তর দশক কে স্বর্ণযুগ বলা শুরু হয়। বলা হতে থাকে যে স্বর্ণযুগে শিল্পীদের প্রচন্ড নিষ্ঠা ছিল, সেটা নাকি এখন নেই তাই সবাই কে সেই পুরোনো গান ই গাইতে হচ্ছে। ব্যতিক্রম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। উনি ৮৯ সালে শিলিগুড়ি রেডিও স্টেশনের একটা সাক্ষাৎকারে সময়ের পরিবর্তনের গুরুত্বের কথা বলেছিলেন (https://www.youtube.com/watch?v=tnaj4VAn_ak). আশির দশকের শেষে এসে ওনার মনে হয়েছিল, মানুষের জীবনের ব্যস্ততা এবং জীবনধারণ নিয়ে চিন্তা এতো বেড়ে গেছে যে তাঁদের পঞ্চাশ ষাট দশকের এর ধরনের গান শোনার মন টা নেই। পুরোনো গানগুলো অবশ্য শুনতেন কারণ সেগুলো চেনা গান।

সেই ব্যাপারটার কিছুটা প্রতিফলন নব্বই এর দশকে 'জীবনমুখী' বা বাংলা ব্যান্ডের গানে দেখা যায়। গানগুলো অনেকটাই সমকালীন মানুষের জীবনযাত্রা, এবং মনোভাবের কথা বলেছিলো এবং অনেকটা মানুষের মুখের ভাষায়। এই ধরনের গান গুলো দশ পনের বছর চলেছিল এবং জনপ্রিয়তায় সেগুলো নিশ্চিতভাবেই স্বর্ণযুগের গানের থেকে কম নয়।

একবিংশ শতাব্দীতে গানের বাণিজ্যের কফিনের শেষ পেরেকটি ও প্রযুক্তির পরিবর্তন। চুরি ক্যাসেট বা সিডি র সময়েও হতো, যখন মানুষ প্রকাশকের কাছ থেকে মূল গান গুলো না কিনে নিজেরা নকল করে নিতেন। কিন্তু সেটা করার জন্যেও হলেও ফাঁ। গানাসেট বা ফাঁকা সিডি কিনতে হতো। কম্পিউটার যোগাযোগের অগ্রগতি (ইন্টারনেট), কম্পিউটারে সংরক্ষণের অগ্রগতি (ইমেজ, ভয়েস, ভিডিও, অডিও) এবং সর্বোপরি সংরক্ষণ ভান্ডারের সহজলভ্যতা (ক্লাউড) গান চুরি এবং অনেকের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়াটা অনেক সহজ করে দেয়। গান প্রকাশ কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে আর লাভজনক থাকেনা। ফলত তাঁরা গান প্রকাশের পেছনে বিনিয়োগের উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। শিল্পীদের নিজের উদ্যোগেই গান প্রকাশ করা শুরু করতে হয়।

ভালো গান সব সময়েই হয়। যখন গান তৈরির পেছনে বাণিজ্যিক বিনিয়োগ ছিল, একটা গান প্রকাশের আগে সেই গানের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ও খতিয়ে দেখা হতো। তাতেও সব গান হিট হতোনা। আর এখন যখন কোনো বিনিয়োগ নেই, শিল্পীদের নিজের উদ্যোগে গান প্রকাশ করতে হয়, সেখানে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার ব্যাপারটা একদম ই থাকেনা। বিনিয়োগের অভাবে গান সব শ্রোতাদের কাছে পৌঁছোয়না তাই তাঁরা ভালো মন্দের হিসেব করে উঠতে পারেন না। উপার্জনের জন্যে অনুষ্ঠান শিল্পীদের করতেই হয়। তাঁদের নিজেদের গান সম্বন্ধে শ্রোতাদের বিশেষ ধারণা যদি না থাকে, তাঁদের ও ভরসা করতে হয় সেই চেনা গানের দিকে। সেই চেনা গানগুলো কত ভালো ছিল বোঝানোর জন্যে স্বর্ণযুগ কথাটা আরো বেশি করে প্রচার করতে হয়।

স্বর্ণযুগের গান মানুষের কাছে বেশি করে পৌঁছতো বাণিজ্যিক বিনিয়োগ ছিল বলে, আর এখন ও বাণিজ্যিক কারণে সেই যুগটাকে ধরাছোঁয়ার বাইরের একটা সময় হিসেবে প্রচার করা হয়। নাহলে পরিবর্তন কিন্তু সব কিছুতেই হয়েছে কিন্তু গানের মতো সেগুলো নিয়ে এরকম বলা হয়না।

Our family story of 5 generations of Medical Doctors

Ritika Sarkar

I am proud to narrate the story of my family history of medical doctors who have for the last 5 generations served their communities with medical care at home and abroad since the mid-1850s.

The Doyen

Around 1857 when the Sepoy Mutiny (সিপাহী বিদ্রোহ) was raging in India, not far from Barrackpore, a newly qualified doctor returned from Calcutta to his native village of Saguna in Nadia district to start his medical practice. Little did he know that he would start a lineage of medical doctors who were going to dedicate their professional careers both in India and abroad for 5 generations to come.

Though some of the written records have been lost with the passage of time, my family history is very much alive and have been passed down to us by our relatives, some of whom still live in our ancestral village.

My great great great grandfather Dr Madhusudan Sircar was born in Saguna, Nadia in undivided Bengal. He was from a well-to-do family of landowners. He graduated from Medical College, Calcutta and started his practice locally. In Saguna near Madanpur, he would pay home visits to see his patients and travel on horseback. Armed with contemporary medical training, he was particularly involved with medical relief work during waterborne epidemics like cholera, which caused massive mortality during those times.

He later became a Medical officer in the Octavius Coal Company headquartered in Old Court House Street in Calcutta. He was subsequently posted to the company's mining areas at Dumka in Bihar, where he would provide emergency and non-emergency medical care to the coal miners (and some European officers in the mining area). He advocated for Health care rights of Mine workers before The Miners Act was enforced in India in 1901.

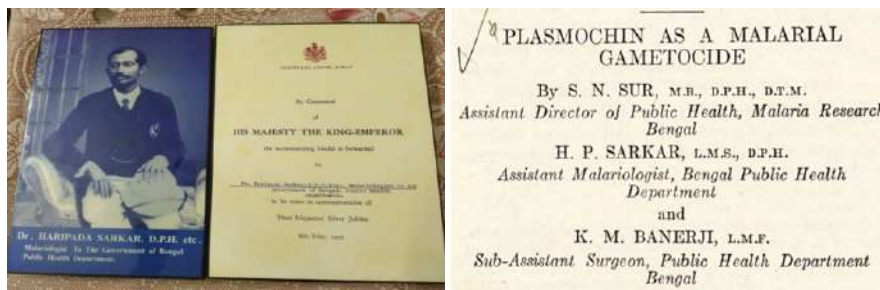
He later bought the Haldipahari Estate near Shikaripara, Dumka, at a state auction. Spanning around 5,000 bighas, it remained the Sarkar family's country retreat for generations. The estate included a thatched main house, কাছারি বাড়ি, horse stables, and part of the Brahmani River along its border.

The Malariologist

Dr Madhusudan Sircar had three sons, Haridas, Haripada and Harimohan, and two daughters. My great-great-grandfather, Dr Haripada Sarkar, was born in the same village and followed his father into medicine, graduating with an LMS in 1906 from Medical College, Calcutta. He later obtained a postgraduate Diploma in Public Health (DPH) from Calcutta University. He joined the School of Tropical Medicine, Calcutta, as an Assistant Malariologist in Public Health-Malaria Research and later became Malariologist to the Government of Bengal. He married Sarojini Devi, and settled in Shyamnagar. Between 1929 and 1932, he and his colleagues published research in the Indian Medical Gazette on malaria prevention, novel larvicides and disease epidemiology. He also served as faculty at the Seventh Congress of the Far Eastern Association of Tropical Medicine in Calcutta in 1927, alongside Lieutenant Colonel V. B. Green Armytage - of Eden Hospital, Medical College, Calcutta.

During his career, Dr Sarkar was posted to Cuttack in Orissa, and Munshigunge, Bhagalpur in Bihar. For his contribution to Public Health, he received a medal from King-Emperor George V during the Silver

Jubilee in 1935. He retired at 60 and passed away aged 62 in 1942.



A Doctor and gifted musician

My Great grandfather Dr Gour Krishna Sircar was the eldest of 9 children of Dr Haripada Sarkar. He was born in 1906, in their house at Kapteypara Road, Athpur, 24 Parganas. He attended Campbell Medical School, Calcutta (now NRS Medical College) and obtained his Licentiate of Medical Faculty diploma in 1933, under the State Medical Faculty of Bengal. His Examiner in Midwifery was the legendary Prof V B Green-Armytage. Apart from being a good student he was also a talented musician and was the orchestra master of his Medical school. He could play many musical instruments but his favourite instrument was the violin. I'm told there used to be regular musical sessions “গানের আসর” in the house. He married my great-grandmother Mrs Pushpa Bala Sircar and they had 5 children. His hobbies also included football, fishing and hunting.

Following in his father's footsteps, he joined the Health Service of the Government of Bengal as an Epidemiologist. His work required him to travel to far flung areas of the eastern province including border areas of Burma, villages and towns now in Bangladesh and districts of Bengal to attend to people at times of famine, floods and epidemics of cholera, Kala azar and malaria. He resigned from Government service in 1946, a year before Indian Independence and became a general practitioner in his home town of Athpur. He opened a clinic called Hari clinic named after his father. His fee was one rupee. He became the first physician for ESI (Employee's State Insurance) in the Industrial belt of 29 jute mills and factories and remained so till the age of 82. He had several acquaintances including Indian Olympian and Mohun Bagan footballer Kesto Pal and Sahitya Academy winning Modern Bengali novelist Shri Samaresh Basu, as a young budding writer at that time, who wrote and edited a hand written magazine called Udayan ‘উদয়ন’ in Athpur. He travelled to the United Kingdom and France in 1975 for a family visit. He also became an Associate Member of the Royal Society of Medicine (ARSM) in London. My great-grandfather was a well-known physician in the community and was very well skilled. He lived his life thoroughly and



Dr G K Sircar in UK



Dr GK Sircar, Dr DK Sarkar & R Sarkar



Standing L-R - JC Bose, A Paine Late Sisir Saha . Sitting L-R - D K Sarkar, Late T Banerjee. Darjeeling 1961

passed away peacefully at 88 years of age in 1994.

Friend, Philosopher and Guide

My grandfather, Dr Dipak Kumar Sarkar, was born in Babugunge, Hooghly district, in 1940, the third child of Dr Gour Krishna Sircar. He joined RG Kar Medical College for his MBBS in 1958. In his third year, he was fortunate to attend lectures by Dr B. C. Roy, the legendary Chief Minister and architect of modern West Bengal. His elder cousin, Dr Nirmal Pal, also an RG Kar Medical College graduate, was his mentor and guide. He obtained his Diploma in Obstetrics and Gynaecology (DGO) from Calcutta University in 1967 and worked at Chittaranjan Seba Sadan and M R Bangur Hospitals, Calcutta under Dr GC Nandy and Dr Sudhin Sen.

He married Dr Rupali Sarkar (née Basu) of Asansol in 1967. She was a graduate from CNMC. At the time, Calcutta and wider West Bengal were experiencing intense political unrest due to the fragile United Front Coalition government and the Naxalbari uprising. The same year, my grandparents travelled to the UK, where my grandfather subsequently became a Member of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (MRCOG), while my grandmother trained as an Anaesthetist with the Faculty of Anaesthetists of the Royal College of Surgeons, London and lived in Middlesbrough.

My father, Rupak Sarkar, and my aunt, Dr Piali Das MFDS FRCS (née Sarkar), were both born in Middlesbrough. My grandfather was Senior Medical Officer in Women's Health at the Child Health Centre in Hartlepool, and was Deputy Lecturer at the Central Midwives Board UK. His mentor was Consultant Gynaecologist, Mr B. H. Ellis. My grandparents returned to India in 1978, after which he continued his private practice, mainly in Shyamnagar and various hospitals in and around Calcutta and mentored many junior colleagues. Extremely popular among his friends and colleagues at 86 years of age, he remains academically active as a member of the Bengal Obstetrics and Gynaecology Society (BOGS) and a retired Fellow of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. He organises his Medical class reunions 60 years on. He also regularly visits us in the UK.

Caesar is born

My father, Dr Rupak Kumar Sarkar (nicknamed Caesar) was born by Caesarean section on Durga Sasthi 'মহা-ষষ্ঠী' in Parkside Maternity Hospital, now James Cook University Hospital, Middlesbrough. He studied at Nunthorpe Primary School. After our family returned to India, he attended Modern School, Barrackpore, and South Point High School, Calcutta. Notably, South Point High School was the world's largest school in 1984, according to the Guinness Book of World Records, when my father and aunt were pupils there.

After his medical degree from Bangalore University, he worked as a Tutor in O&G at his Medical school. During that time, he participated in many voluntary Free Medical Advice Camps in remote villages across West Bengal, Bihar and Orissa. A keen adventurer and nature lover, he has also undertaken several high-altitude Himalayan trekking expeditions in India and Nepal.

After a short stint as a Registrar in O&G at Peerless Hospital, Calcutta, he travelled to Ireland in 2001 just after the 9/11 world-wide calamity. He completed his DGO at Trinity College, University of Dublin, based at The Rotunda Hospital, Europe's oldest Maternity Hospital established in 1745. He married Dr Ranjana Sarkar MRCPI (née Dhar), in 2004. Following his Membership of the Royal College and Higher Specialist Training in Ireland, he is now a Consultant in Obstetrics and Gynaecology in the NHS UK. He was a Trainee representative at the RCPI, RCOG and Medical Council and Chair of Ireland's Junior O&G Society (JOGS) in its Silver Jubilee year.



Outside of medicine, my father is a classic VW Beetle car enthusiast, enjoys gardening, and is an active member of the Sheffield & Districts Durgotsab and Cultural Committee, based in Barnsley.

It is a rare feat that 5 generations of a single family have dedicated their professional lives to the health and wellbeing of the communities they lived in. Only a handful of families have been recorded to have achieved this distinction globally. I am proud to be part of this family and hope to join this lineage in the future.

Acknowledgements: Dr D K Sarkar FRCOG, Dr R K Sarkar FRCPI(O&G) and family.

The Great Bunny rescue

Vidushi Vedika Chakrabarty

Year 4

During the summer holidays I went with mummy to Magna. My friends were coming with their mothers too. I was so excited. It was a sunny morning. Magna was huge and exciting, with lots of amazing things to see and do. First we played in the adventure area and then we decided to explore the place. It is an enormous old steelworks with four pavilions called Air, Earth, Fire and Water.

I brought my favourite little bunny with me. She goes with me every where Her name was Fluffy. She is soft, and cuddly with and had big brown ears. I loved carrying him around because he was my best friend.

We were walking along the mezzanine floor when suddenly Fluffy jumped out of my arms.

“FLUFFY!” I shouted.

He bounced across the floor and, before I could catch him, he fell over the edge!

“Oh no!” I cried. “My bunny!”

I looked down and saw Fluffy sitting on the floor below. He looked very small and frightened.

I ran to find a member of the Magna staff.

“Please help me! My bunny has fallen onto the floor below!”

The kind staff member quickly came to help. Another member of staff joined them, and they carefully worked out how to rescue Fluffy. Magna has lots of walkways and lifts around the building, so the staff were able to get safely to where he was. I waited nervously. I prayed with folded hands. God. Please get my Bunny back.

Then I heard, **“We’ve got him!”** A staff member came back carrying Fluffy very carefully. “

FLUFFY!” I shouted happily. I hugged him tightly. He gave his little nose a wiggle as if he was saying, “That was a scary adventure!”

“Thank you so much!” I said to the Magna staff. They smiled and said, “He certainly has had an exciting day!”

From then on, I held Fluffy very carefully. We went on to explore Magna, but Fluffy stayed safely in my arms for the rest of the day.

It was the most exciting—and frightening—adventure we had ever had.

And Fluffy was definitely the bravest bunny at Magna!

And Mamma now knows that I love Fluffy much more than she loves me.



The End

Bedese Baro mase Tero Parbon

Dr Mallicka Malati Chakrabarty

This phrase in Bengali means Thirteen festivals in twelve months and this does not have to change for Bengalis living away from home. Living abroad may take Bengalis away from their homeland, but it never takes them away from their culture and traditions. Across the UK and around the world, Bengali communities celebrate their festivals with immense enthusiasm, warmth and vigour.

Every occasion becomes an opportunity to come together, dress in traditional attire, prepare delicious Bengali food, enjoy music and cultural programmes, and pass cherished traditions on to the next generation.

These celebrations are more than festivals—they are a way of keeping Bengali identity, heritage and community spirit alive, even thousands of miles from Bengal. Whether in a community hall in London or a small gathering among friends and family, the familiar sounds, flavours and rituals create a little piece of Bengal abroad.



This write up summarises some of the local celebrations that echo the above ethos.

Poush Sankranti – The Harvest Festival

Poush Sankranti marks the end of the Bengali month of Poush and the beginning of Magh. It is traditionally associated with the harvest season and is celebrated with great warmth across Bengal. One of the most loved traditions is making and sharing pitha and puli—delicious Bengali sweets and savouries prepared with rice flour, coconut, jaggery (gur) and milk. Families come together to enjoy these seasonal delicacies and celebrate abundance. For Bengalis living abroad, Poush Sankranti is a beautiful way to keep ancestral traditions alive, bringing families and communities together through food, culture and celebration.

Finding the items in the markets of England and transforming them to delicacies may seem challenging but when passion to do it is there, nothing can deter

Breaking the dews on a frosty cold morning having pule-pitha, pati-sapta with noleen gur What better way to celebrate Poush Shankranti.



Holi- the festival of colours



Holi, known as Dol Jatra or Dol Purnima in Bengal, is a vibrant celebration of colour, joy, love and togetherness. People come together to play with colourful powders, enjoy music and dance, share delicious sweets, and celebrate the arrival of spring. For Bengalis, Dol Jatra has a special cultural flavour, with traditional songs, Rabindra Sangeet, dance and beautifully decorated idols of Radha and Krishna.

It is a festival that brings people of all ages together—celebrating friendship, happiness and the colourful spirit of Bengali culture. The cob webs of winter, are washed away in the enthusiasm, colours dance and delicacies with the gathering of friends.

Mother's Day

Mother's Day is a celebration of love, gratitude and the special bond between mothers and their children." Also known as Mothering Sunday, is a special day to celebrate mothers, grandmothers and the important women who care for and nurture us. Families often mark the day with flowers, cards, chocolates, homemade gifts and a special meal. For children, it is a chance to say thank you for all the love, care and support their mothers give throughout the year. For Bengali families in the UK, Mother's Day can be a lovely blend of British traditions and Bengali family values, bringing generations together and celebrating the special bond between mothers and children. Our celebrations extended to celebrate the mothers who are here and those who are in our hearts, never missed forever loved. Good food, great company song dance and music make the perfect environment to be grateful to all Ma's.



Father's Day

Father's Day is a beautiful occasion to celebrate the love, strength and guidance of fathers and father figures, and to thank them for all that they do for their families. A day dedicated to celebrating dads, grandfathers and father figures, bringing families together to show appreciation for their love, care and support. Our Father's Day celebration was a day of love, appreciation and gratitude for the special men who

inspire, support and guide us..... cupcakes, wrist bands songs and dance and great food with enthusiastic company

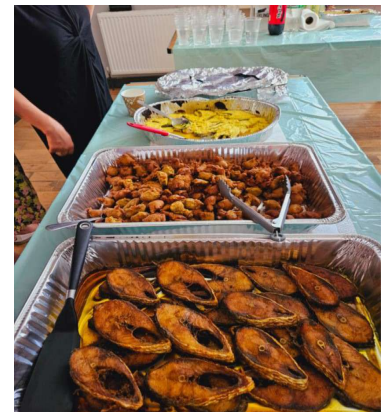
Ilish utsav

Ilish Utsav is a joyful celebration of the much-loved Hilsa fish (Ilish), an iconic part of Bengali cuisine and culture.

It brings Bengalis together through traditional Ilish dishes, family recipes, music, friendship and community spirit. From Ilish Bhapa (steamed) to Shorshe Ilish,(mustard and fish) the festival celebrates the rich flavours and culinary heritage of Bengal.

For Bengalis living in the UK, Ilish Utsav is a wonderful way to keep Bengali food traditions alive and share them with the younger generation, while bringing the community together.

For the second successive year this celebration touches the Non resident Bengali's heart with food that's so close to their tradition and roots. Tireless efforts of the organisers to get good quality fish in abundance cooked with love, seasoned with tradition and served with pride enjoyed with laughter will be always remembered with fondness.



Extended Celebrations.

A celebration shared is a celebration doubled in joy and togetherness, happiness and fulfilment. The generosity of the people gathering for this means is spread to suburban villages children, elderly and the common person. A celebration shared is a tradition kept alive, a community brought together with bonds that cross the geographic barriers.

Long live Bengali traditions—celebrating our heritage, sharing our culture, and passing the beautiful spirit of Bengal on to future generations.

Our Front Garden Reimagined

*Three weeks, Three People, Relentless Hard Work, Design and Redesign and Countless B&Q Runs
- One Garden we Absolutely Love*

-By Ishita Chatterjee & Tirthankar Chakraborty

Last summer, we decided our front garden deserved more than a tidy-up. We wanted to turn an overlooked patch into a place with colour, texture and little moments of discovery - without sacrificing the mature trees and shrubs that already gave it so much character.

The plan was deliberately layered: a pebble-and-stepping-stone walkway, a sensory patch of real grass, a tiny seat tucked at the far end, defined planting zones and a crisp white raised border beside the drive. Everything new would be built around what was already thriving.

Where we Started



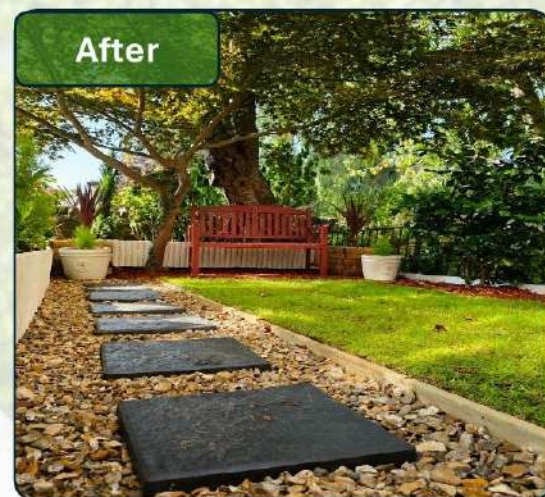
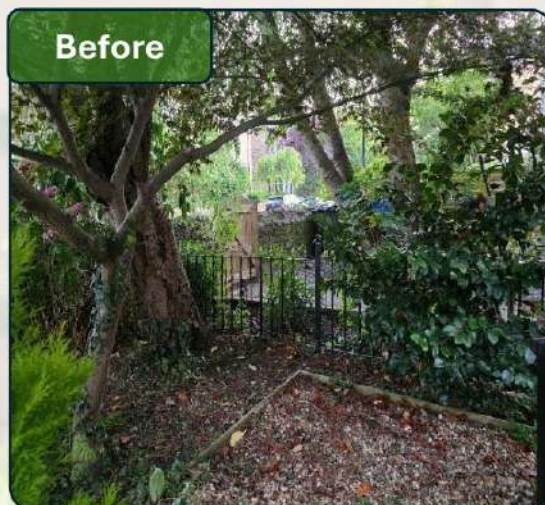
The bones were good, but the garden felt undefined and hard to maintain. Our wish list was deliberately varied: a pebble-and-stepping-stone walkway, a sensory patch of real grass, a tiny seat at the far end, distinct planted zones - all woven around the established planting rather than replacing it.

THE MAKING OF IT - *Evenings, weekends, painting, drilling, edging, lining, planting, mulching & constant doublechecking*

It became a proper three-person project for us (Ishita, Mum and Tirthankar). Most of the work happened after our day jobs, into the evening, or at weekends. For three weeks our spare hours disappeared into digging, measuring, painting, sawing, edging, lifting plants and planting them all over again.

The practical work was all about creating definition while protecting the garden's existing character. We edged the different areas to make each zone feel deliberate, built a white raised planter border along the driveway side, and carefully lifted and replanted some plants into the new beds. There was a heroic amount of weeding. To make future maintenance less of an annual battle, we laid geotextile membrane around the main planting on the soft surfaces before finishing the beds with bark mulch.

We chose two mulch tones, using plenty of the red bark to bring warmth and an extra bit of oomph against the greens, black railings and white edging. Not every idea survived contact with real roots, awkward corners and the dimensions of the site, so there were compromises and little redesigns along the way. That became part of the fun: solve one problem, stand back, squint at it, then carry on.





From boot-fulls
of materials to a
garden with
purpose

There were repeated B&Q runs for more soil, more turf, more plants, timber, joinery, more geotextile lining and inevitably, more bark mulch. Getting everything home was a project in itself: timber threaded through the car, plants squeezed into every remaining gap and rolls of turf stacked wherever they would fit. Somehow, it all did.



And then we had our Finished Front Garden

By the end, the front garden had changed from a space we simply looked at into one we could actually use. The stepping stones invite you through it, the grass gives a soft sensory contrast to the gravel and mulch, the little seating spot creates a destination, and the retained mature planting makes the whole scheme feel as though it belongs there rather than having arrived overnight. It may have taken three very busy weeks but watching the vision come to life made every tired evening worth it.



A usable little garden, full
of colour and
unmistakably ours!

Three weeks, few compromises and a great deal of muddy determination later, the front garden had become a space that finally felt like ours. Best of all, every corner carries a memory of building it together.

**VISUAL
ANTHOLOGY**
তুলি ক্যামেরা
ও কল্পনা



Painting by Subir Sen

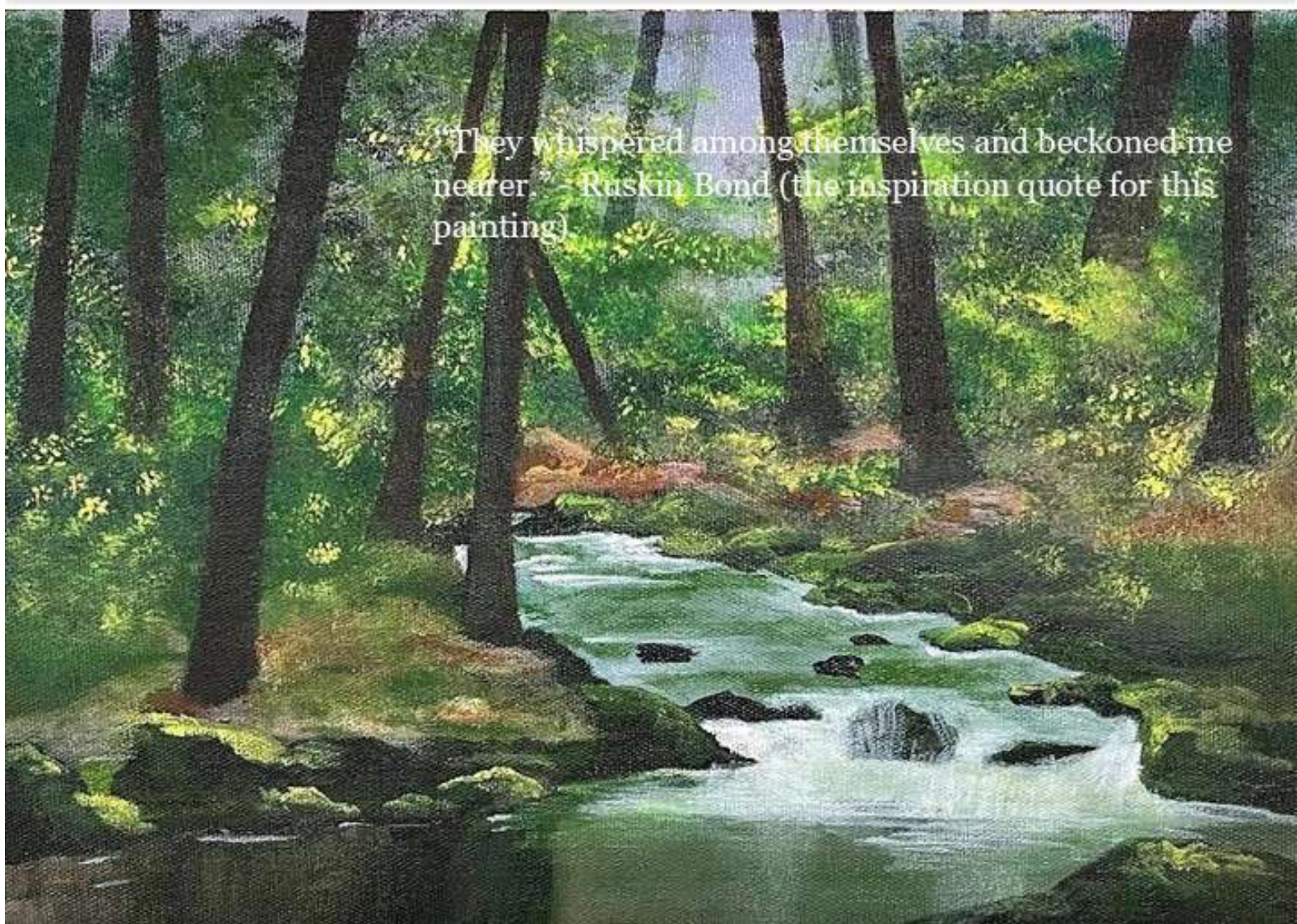


Painting by
Neepa Bandyopadhyay



The Shades of
Winter Wonderland

Acrylic on canvas created by Asitama Sarkar



"They whispered among themselves and beckoned me nearer." - Ruskin Bond (the inspiration quote for this painting)



‘প্রথম আদি তব শক্তি—আদি
পরমোজ্জ্বল জ্যোতি
তোমারি হে
গগনে গগনে—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

**Oil Painting by
Smt. Karabi Banerjee**



Painting by
Ahaana
Mukherjee-Patel.
9 years



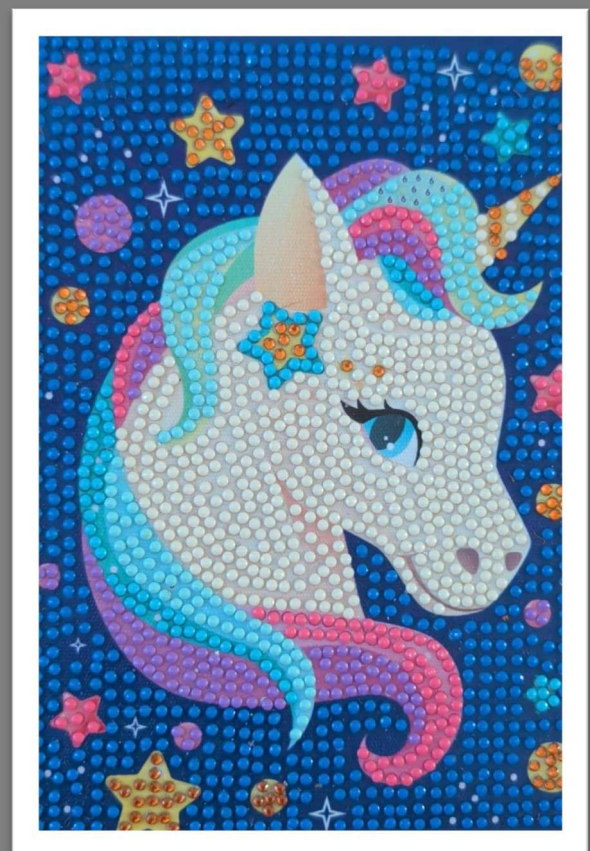
Painting by
Aarushi Diyani Mukherjee
Patel.
6 years



‘Summer time and Ice cream’ by Rieva Biswas-Ager, Age-4



"The clouds and Ballons"
By Lily Biswas-Abrol,
age-3



Diamond Art work by
Norah Sengupta

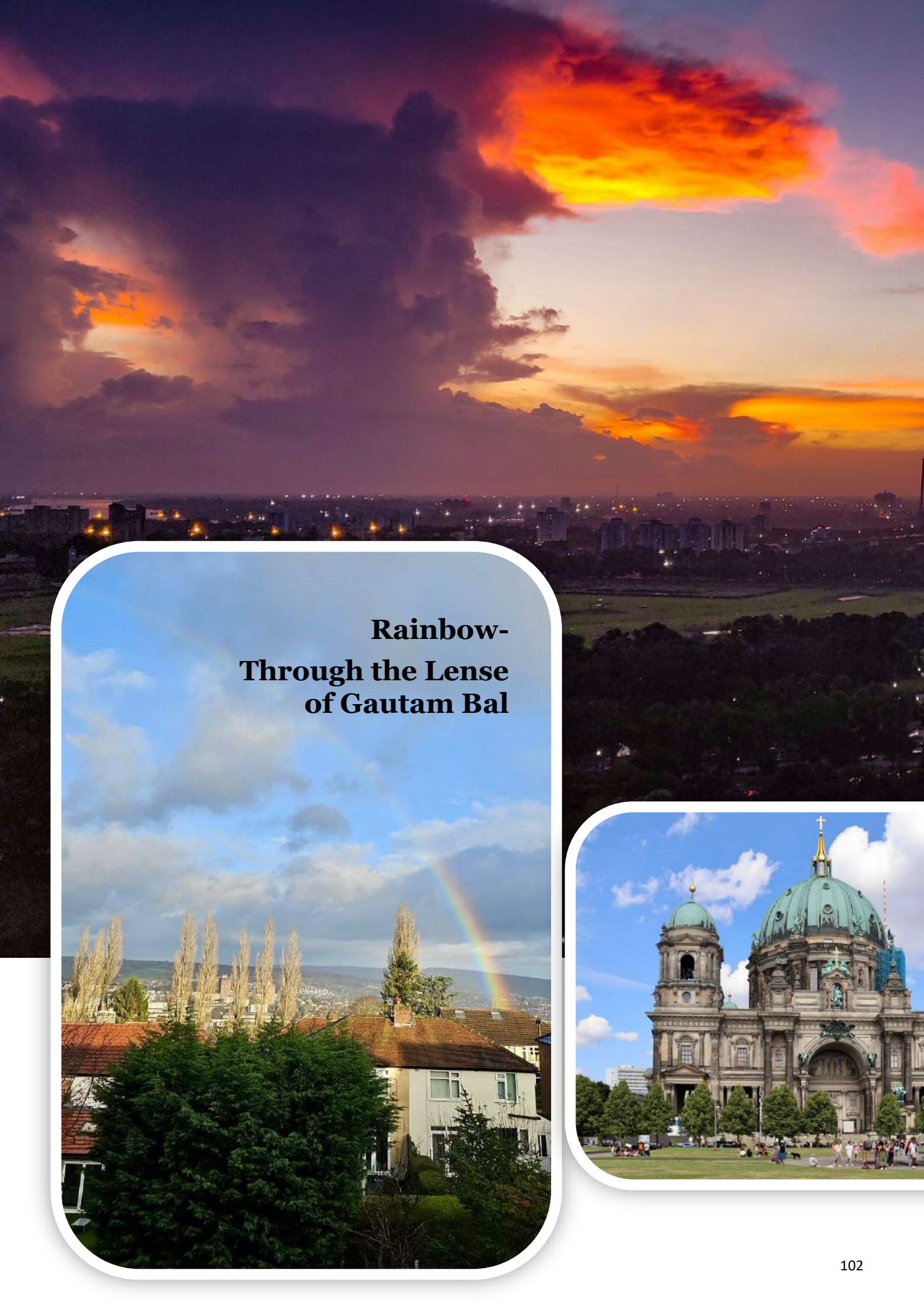


"Dancing Flames" by *Abira Ghosh*

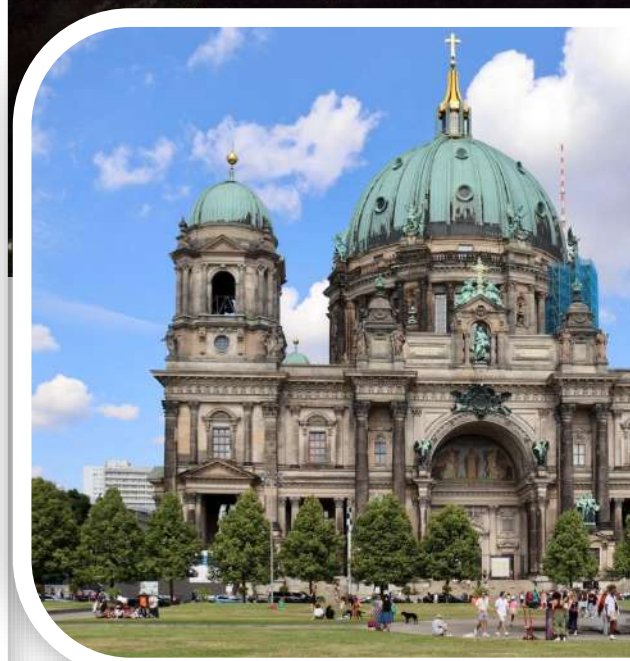
Celebrates the warmth, movement and magic of a campfire beneath the night sky - its fiery orange and red flames twisting and turning almost as if they're dancing to a secret song, while tiny sparks float into the night like little stars.

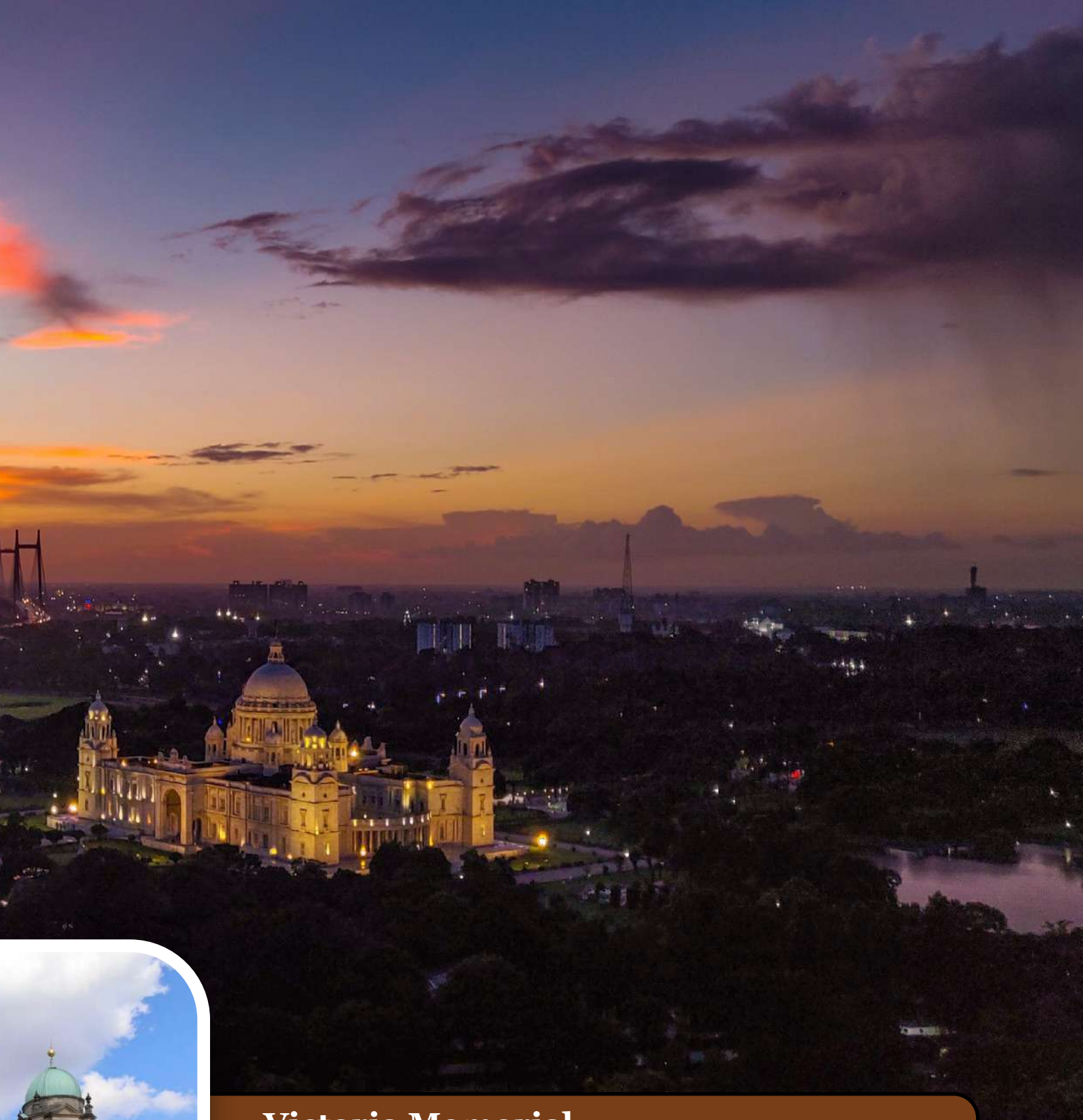


Painting by Surovi Saha Sengupta



**Rainbow-
Through the Lense
of Gautam Bal**





**Victoria Memorial—
Through the Lens of Rohan Bal**



**Berliner Dome-
Through the Lense of
Gautam Bal**

Journeys in Frames

Travel has always been very therapeutic for me. The excitement starts at least 2 weeks before the holiday actually begins. Making an itinerary, packing, and planning where to stay and what to explore have fascinated me since childhood. Life has allowed me to travel to various destinations in India and abroad. Armed with a smartphone, it has become easier for me to capture certain places from an angle which caught my attention then and there. The mesmerising beauty of each place captured by my camera has its own history, pride and special memory in my heart, which will stay with me forever. Through Kashphool, I thought of sharing some moments and some places which have intrigued me. Hope you all like my clicks as well.

Runa Bandyopadhyay



Through Runa's
Lens

DELICIOUS DIARIES

স্বাদের ডায়েরি

Chingrir Malaikari

Mimi Grobecker-Das

This recipe is from my Boro Pishimoni, who made the best chingri-r malaikari I've ever tasted. I don't think I'll ever be able to have this dish without thinking of her.

A lot of the flavour depends on the freshness of the prawns. Ideally, buy fresh, large prawns (golda chingri, though tiger prawns will do), preferably de-veined but head and shell still intact, as they add a lot of umami to the dish.

Ingredients

For the marinade

400g prawns in shell

1 tsp salt

1/2 tsp turmeric

1/2 tsp chilli powder

2 tbsp mustard oil

1tbsp Sunrise yellow mustard powder, soaked at least 15 minutes in advance in 1/2 cup of water. If not available, you can soak and grind 2 tbsp of yellow mustard seeds.



For the main curry

2 tbsp mustard oil

1 medium red onion, diced

4 garlic cloves, finely chopped

2 tbsp ginger paste

1 tsp cumin powder

1/2 can coconut milk

1 tbsp coconut cream

4-5 fresh green chillies, cut lengthways

Method

1. Combine the marinade ingredients with the prawns and let it sit for at least 30 mins. I make the marinade and then prep the rest of the ingredients.
2. In 2 tbsp mustard oil, fry the garlic, and then the onion. When the onions are starting to become translucent, add the ginger paste. Saute until the onions are cooked and the raw smell of ginger has gone away. Add the cumin powder and stir.
3. Add in the marinated prawns. Give it a good stir so you start seeing some colour on the prawns, and then add in the coconut milk, coconut cream, and slit green chillies. Give your marinade bowl a quick rinse with a 1/2 cup of water and add that in too. Stir to combine, turn the heat down very low, and leave with a lid on to simmer for 30 minutes.
4. Add a dash of mustard oil at the very end if you like the taste of mustard.

Chilli Chicken

Binita Dutta

Chilli Chicken is an all-time favourite loved by both adults and kids. It's one of those irresistible dishes that has stolen the hearts of everyone with its delicious combination of crispy chicken, colourful vegetables and flavourful sauces.

Ingredients

For the chicken marinade:

- * 400 g boneless chicken, cut into small pieces
- * 2 eggs
- * 1 tsp ginger-garlic paste
- * A little vinegar
- * Black pepper powder, to taste
- * Red chilli powder, to taste
- * A little salt
- * A little plain flour

For the stir-fry:

- * 1 carrot, cut into small pieces
- * 2 capsicums, cut into small pieces
- * 2 spring onions, chopped
- * 1 small onion, chopped
- * Ginger, finely chopped
- * Garlic, finely chopped
- * 1–2 green chillies, finely chopped (optional)
- * Soya sauce, to taste

Method

1. Marinate the chicken:

In a bowl, add the chicken, vinegar, black pepper powder, red chilli powder, ginger-garlic paste, eggs, salt and plain flour. Mix everything well until the chicken is evenly coated. Cover and leave to marinate for 30 minutes to 1 hour.

2. Deep-fry the chicken:

Heat oil in a deep pan. Once hot, carefully add the marinated chicken pieces and deep-fry until golden brown and cooked through. Remove and set aside.

3. Cook the vegetables:

Heat a little oil in a large pan or wok. Add the chopped onion, ginger, garlic and spring onion. Fry for a minute, then add the carrot and capsicum. Add the green chillies if using. Stir-fry until the vegetables become slightly soft while still retaining some crunch.

4. Add the chicken and sauces:

Add the fried chicken pieces to the vegetables and mix well. Add soya sauce, tomato sauce and chilli sauce according to your taste. Stir everything together and cook for a few minutes.

5. Thicken the sauce:

Add the cornflour mixture little by little while stirring continuously. Cook until the sauce reaches your desired consistency.

6. Garnish and serve:

Garnish with chopped spring onion and green chillies. S

Serve hot with fried rice, noodles, or plain rice and enjoy!



Crispy Homemade Chicken Kebabs

Binita Dutta

Crispy, golden and packed with flavour, these homemade chicken kebabs are a family favourite. With tender chicken, aromatic spices and a deliciously crunchy breadcrumb coating, they make the perfect appetiser, snack or easy family meal.

Recipe Details

Prep Time: 20 minutes

Cooking Time: 20–25 minutes

Total Time: 45 minutes

Serves: 6–8

Difficulty: Easy



Ingredients

For the Kebabs

- * 700g chicken, minced or finely chopped
- * 1 boiled potato, mashed
- * 3 eggs
- * 1–2 medium onions, finely chopped
- * 1 small tomato, finely chopped
- * A small handful of fresh coriander leaves, finely chopped
- * 3–4 green chillies, finely chopped (optional)
- * 2 tablespoons gram flour
- * Breadcrumbs, for coating
- * Oil, for frying

Spice Mix

- * 2 teaspoons coriander powder
- * 1 teaspoon cumin powder
- * 1 teaspoon red chilli powder
- * 1 teaspoon garam masala
- * 2 teaspoons tandoori masala
- * Salt, to taste

Method

Make the kebab mixture. Add the chicken, mashed potato, eggs, chopped onions, tomato, coriander and green chillies to a large mixing bowl. Add the gram flour and all the spices. Season with salt and mix everything thoroughly until all the ingredients are evenly combined. Shape the kebabs. Take a small portion of the mixture and shape it into a ball. Flatten it gently between your palms to create a classic kebab shape. Continue until all the mixture has been used. Coat with breadcrumbs. Place the breadcrumbs in a separate plate. Gently roll each kebab in the breadcrumbs, making sure it is evenly coated on all sides. Fry until golden. Heat enough oil in a frying pan over medium heat. Carefully place the kebabs into the hot oil and fry until beautifully golden and crisp on both sides and cooked through. Avoid overcrowding the pan — fry in batches if necessary. Drain & serve Transfer the cooked kebabs onto a plate lined with kitchen paper to remove any excess oil.

Chef's Tips

Keep the mixture manageable: If the mixture feels too soft or sticky to shape, add a little extra gram flour or breadcrumbs.

Chill before frying: For firmer kebabs that hold their shape better, refrigerate the shaped kebabs for 20–30 minutes before frying.

Make ahead: The kebabs can be shaped and breadcrumb-coated in advance and kept refrigerated until you're ready to fry them. Also you can freeze for later.

Serve hot, dip generously and enjoy!

With Love, We Remember

Dr Nilanjan Basu

1937 - 2026.



It is with deep sadness that we announce the passing of Dr Nilanjan Basu, aged 88 (or 89 officially). A devoted family man, respected former general practitioner, and proud graduate of Calcutta National Medical College. He passed away peacefully after a rapid decline in his health due to cancer. Whilst he will be sorely missed, we are all enormously grateful for his life. His enduring legacy is of having made countless lives profoundly better by his professional excellence, his loyal friendship, his love of family, and an integrity of heart and generosity of spirit.

Nilanjan was born in 1937 in the tea estates of Assam during the British Raj. His early childhood was marked by the global upheaval of World War II and the subsequent Partition of India, which forced his family to relocate from their ancestral home in East Bengal to Kolkata. Demonstrating a sharp intellect from a young age—and

unusually holding two birthdays due to school enrolment adjustments—he went on to study at the Calcutta National Medical College in 1956, graduating in 1961.

While working as a junior surgical doctor at the TB hospital in Mumbai, Nilanjan met Julia Cutinha, a beautiful surgical nurse who became the love of his life. Defying cultural and religious expectations of the era, and enduring a three-year separation across different continents, their bond stood unbroken through seven years of courting and nearly 55 years of marriage. They married in Oxford on 6 November 1971. Nilanjan's early medical career took the family across England, from Tynemouth to London, before they welcomed their daughter Anita in Bournemouth. In 1977, the family temporarily moved to Nassau, Bahamas, where their son Neil was born, before ultimately returning to the UK to settle permanently in Barnsley, where their daughter Selina was born in 1982.

Nilanjan spent his early career training to be a surgeon, until a bleed in his right eye in 1981 permanently reduced his vision and ended his surgical aspirations. Facing this life-altering setback with immense grace, he pivoted his medical career to general practice. As a GP he utilised his varied expertise and love of medicine supporting local clinics at Barnsley District General Hospital. He extended his support of colleagues and patients through his role as an executive member of the Local Medical Committee, and in being a founding member of Barnsley's first primary care commissioning committee. He was also amongst the first GP appraisers in Barnsley during the introduction of medical appraisal. Having been invited by senior medical colleagues, he was also actively involved in supporting the local Barnsley district Puja committee, regularly attending AGMs and musical functions, as well as Pujas. A beloved and highly respected Barnsley GP, he devoted himself selflessly to the care of his patients, colleagues and wider community until his retirement at the age of 71.

Nilanjan's greatest love was his family. In his later years, he took immense joy in his role as father, and grandfather, celebrating every milestone and success of his five grandchildren: Reuben, Rachel, Ariana, Bethan, and Priya. He also delighted in spending time with his wife, Julia, an ever present at his side to the very end, and the love of his life.

Remembered by all who knew him as the humblest of men with the biggest of hearts, Nilanjan's life was a testament to enduring love, integrity, hard work, and triumph over adversity. He will be deeply missed but forever celebrated by his family, friends, colleagues, and the countless patients he served.

With Love, We Remember

Dr Ajit Kumar Garai

1941 - 2025

Dr Ajit Kumar Garai, beloved husband, father, grandfather, doctor and friend, passed away peacefully on 31 August 2025, aged 84. Ajit was born in Burdwan, West Bengal, India, in 1941. He studied Medicine at Kolkata National Medical College, graduating in 1965, before specialising in Obstetrics and Gynaecology. In February 1970, he married Preeti Sadukhan, beginning a partnership that would last for more than 55 years.

In 1971, Ajit moved to the United Kingdom and began what became a long and distinguished medical career. He worked in several parts of the country, including High Wycombe, Liverpool and Huddersfield, before settling at Scunthorpe General Hospital in 1980. Scunthorpe became the family home for many years, and Ajit became a highly respected member of both the hospital and the wider Bengali community.



Ajit was particularly prominent within the Bengali doctors' community in England. At Scunthorpe General Hospital, he took an active role in managing the Junior Doctors' Group, including organising meetings sponsored by pharmaceutical companies. He was also closely involved with the Sheffield District DURGOTSAB & Cultural Committee, based in Barnsley, serving as its convenor for a period.

For Ajit, however, community involvement was about much more than organising events. It was about bringing people together. During the Durga Puja, Saraswati Puja and Lakshmi Puja celebrations in Barnsley, he took responsibility for catering — a task he approached with enormous enthusiasm. He would shop for all the groceries, organise the ingredients and then spend hours cooking, ably supported by Preeti. He also organised food for other important Bengali occasions, including Bijoya Dashami and the Bengali New Year.

These were some of Ajit's happiest times. He took enormous pleasure in seeing people enjoying themselves, gathering around tables and, above all, having full plates of food. Feeding people was one of the ways he expressed his love and hospitality. His cooking and generosity became an important part of the memories many people have of him.

Ajit also helped organise cultural programmes in Scunthorpe, sometimes on behalf of NEBDA — the North England Bengali Doctors' Association. When guest artists came from India, he would often take responsibility for arranging the catering for the entire event. Breakfast, lunch and a gala dinner for around 200 people were not unusual undertakings. For Ajit, they were simply another opportunity to make sure that everyone was welcomed, well fed and looked after.

His commitment to his community reflected his character: energetic, generous, sociable and happiest when he was doing something for other people.

Ajit had to take early retirement in 2003 as his health began to deteriorate. Retirement nevertheless gave him and Preeti the opportunity to travel together for several years, enjoying a different pace of life after his many years of work and community commitments. In 2021, following the COVID pandemic, Ajit and Preeti moved from Scunthorpe to Epsom, London, to be closer to their eldest son, Kinshuk. There, in his later years, he was able to spend precious time with his three grandchildren, who brought him great happiness. Sadly, Ajit's health continued to worsen. After several falls, he was admitted to Epsom Hospital in December 2024, where he was eventually diagnosed with Parkinsonism. In February 2025, he moved from hospital to a nursing home, where he received kind and attentive care during the final months of his life. Ajit is survived by his wife, Preeti, his two children, Kinshuk and Manjuri, and his three grandchildren. He will be remembered for many things: as a dedicated doctor, a

committed member of the Bengali community, a generous host, an enthusiastic organiser, and, above all, as a loving husband, father and grandfather. But perhaps the simplest way to remember Ajit is to picture him surrounded by people, making sure everyone had enough to eat, watching with satisfaction as they enjoyed themselves.

He gave so much of himself to others, and his warmth, generosity and love will remain in the hearts of all who knew him.

May he rest in peace.



THANK YOU FOR READING
Until the next issue...

INDIAN GROCERIES

FRESH FRUIT & VEG

INDIAN MANGOES

POOJA ITEMS

7 DERWENT STREET, SHEFFIELD, S2 5BN

FREE CAR PARK | OPP. TRAM & BUS STOP

SHOP OPEN DAILY: 9AM-10PM

www.agnifoods.co.uk

AGNI FOODS | INDIAN GROCERIES, FRESH FRUIT & VEG



A *Glimpse into Last Year's Festive Magic:*
 Inspired by the timeless artistry of Jamini Roy and lovingly crafted by our members from recycled materials, our Durga Puja mandap and hall became more than just a place of celebration. It became a beautiful memory of creativity, togetherness, and tradition that we will carry with us.

কাশফুল ১৪৩৩
 একাদশ সংস্করণ